মুলুকচাঁদ।

উপন্যাস।

শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত

ও

বেচারাম চাটুর্য্যের লেন হইতে

মিত্র এণ্ড কোংর দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, বিশ্বভাণ্ডার প্রেসে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩১৬।

উৎসর্গ

মাননীয় সদাশয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু [illegible]কৃষ্ণ রায়

ভূম্যধিকারী মহোদয় সমীপেষু।

প্রিয় মহাত্মন,

বাল্যকাল হইতে এক পল্লীতে বসবাস এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আপনার স্বভাব এবং কোমলতা-গুণে আমি চিরবাধিত। আপনি বিখ্যাত বংশের অঙ্কুর এবং সর্ব্বদাই আশ্রিত পালক। আমার এই ক্ষুদ্র "মুলুকচাঁদ" পুস্তক খানি আপনার উদার হস্তে উৎসর্গীকৃত করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি সাদর নেত্রে আমার মুলুক চাঁদকে দর্শন করেন, ইহাই প্রার্থনা, কিমধিকমিতি।

১ নং [illegible] চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ,
১৩১৬।

আপনার চিরানুগত
শ্রী[illegible] মিত্র।

ফুলকুঁড়ি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদীসৈকতে বালক বালিকা আসীন। প্রভাত রবির সুবিমল কিরণে দশদিক হাসিতেছে; সেই হাসির লহরী বুকে মুখে লইয়া কুমার ও কুমারী হাত ধরাধরি করিয়া এক শেফালিকা বৃক্ষতলে পুষ্পচয়নে নিযুক্ত! বালিকাটী আঁচল পাতিয়া ফুল কুড়াইতেছে, বালক কোঁচার খুঁটে ফুল রাখিতেছে—উভয়েই ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্যে নিযুক্ত।

প্রত্যূষে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল, এজন্য বেলাভূমির স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছে, বায়ুসঞ্চালিত পুষ্পরাজি এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বালক অপেক্ষা বালিকার বয়স অল্প, সুতরাং পুষ্পচয়নে বালক যেরূপ ক্ষিপ্রহস্ত, বালিকা তাহা কিরূপে পারিবে? এজন্য মেয়েটীর সঞ্চিত পুষ্পাপেক্ষা ছেলেটীর পুষ্প অধিক হইয়াছে, কিন্তু যে যেমন কুড়াইয়াছে, তাহার সেইরূপই জমিয়াছে, ইহাতে তাহারা উভয়েই সন্তুষ্ট। তবে সময়ে সময়ে বালকের সঞ্চিত কুসুমরাজির প্রতি বালিকা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে। বয়োধিক্য বশতঃ বালিকার মনোভাব বালক সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু বালসুলভ স্বভাবে তাহাকে যে সঞ্চিত পুষ্পদামের কতকাংশ

দিয়া উভয়ে সমান করিয়া লইবে, তাহার সেরূপ প্রবৃত্তি হইতেছে না। অথচ বালিকার ব্যথায় সে যেন একটু ব্যথিত।

যেখানে যে পুষ্প পড়িয়াছিল, একে একে উভয়ে তৎসমুদয় সঞ্চয় করিয়াছে, ভূতলে আর একটীও নাই, কর্দ্দমসিক্ত কয়েকটী পুষ্প পড়িয়া আছে, ধূলি কাদা মাখা বলিয়া সেই সকল পুষ্প ইতিপূর্ব্বে উপেক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে সাগ্রহে বালিকা সেইগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বালক সত্বর আসিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "ছি ভাই! কাদা মাখা ফুলে কি হইবে?" তদুত্তরে বালিকা একটু যেন কাতর হইয়া বলিল, "তোমার ফুল আমার চেয়ে অনেক, আমার এই কয়েকটী মাত্র।"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে কতকগুলি দিতেছি, তুমি কাদা মাখা ফুল লইও না।"

"তবে দাও।"

"এই লও" বলিয়া বালক কতকগুলি ফুল নিজের কোঁচার খুঁট হইতে বালিকার অঞ্চলে ঢালিয়া দিল; স্মিতমুখে বালিকা বালকের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নির্ব্বাক দাঁড়াইতে দেখিয়া, বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি অমন করিয়া রহিয়াছ কেন? আমি আপন ইচ্ছায় তোমায় ফুলগুলি দিয়াছি, লইতে অপ্রস্তুত ভাব দেখাইলে কেন? তুমি কি আমায় পর ভাব?"

"না না—তা নয়, তবে তুমি কষ্ট করিয়া ফুলগুলি জড় করিয়াছ, আমি তোমার ভাগীদার হইলাম, তাই আমার লজ্জা করিতেছে।"

"আমি তোমায় আমোদ করিয়া দিলাম, তুমি লইলে—ইহাতে আর লজ্জার কি আছে ?"

"তুমিও পরিশ্রম করিয়াছ, আমিও করিয়াছি—তবে তুমি—পুরুষ মানুষ, আমার চেয়ে বড়—যত কুড়াইতে পারিয়াছ—আমি তত পারি নাই, তাই তোমার চেয়ে আমার কম হইয়াছে ; তুমি দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে এতগুলি ফুল দিলে—তাই আমার লজ্জা করিতেছে।"

"এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবে কেন ? তোমায় আমায়—দুই জনে এক সময়ে ফুল কুড়াইতে আসিয়াছি, দুই জনের সমান সমান হইলেই ভাল দেখায়—তুমি আমার চেয়ে ছোট কি না—তায় মেয়ে মানুষ—বেশি ফুল ভালবাস ! যদি আরও চাও—আমি দিতে প্রস্তুত আছি, এখনও গাছে অনেক গুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, একটু নাড়া দিলেই—আমরা আরও পাইতে পারি।"

"অনেক হইয়াছে, আমার আর দরকার নাই, তোমার যদি প্রয়োজন হয়—আরও কতকগুলি পাড়িতে পার।"

"না ভাই, আর এ ফুল লইয়া কি হইবে, আমার এখনও যাহা রহিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, তবে গন্ধটা বেশ ; কিন্তু যত বেলা হইতে থাকিবে, ততই শুকাইবে, সন্ধ্যা বেলা এ ফুলের শোভা বা গন্ধ কিছুই থাকিবে না।"

"তুমি আমায় অনেকগুলি ফুল দিয়াছ, আমি এক ছড়া মালা গাঁথিয়া তোমায় দিতেছি।"

"এখানে সূতা কোথা পাইবে ?"

"কেন—যে কাপড় পরিয়া রহিয়াছি, ইহার দশির সূতায় তোমায় হার গাঁথিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া বালিকা

অঞ্চলের প্রান্ত হইতে একখাই সূতা লইয়া ফুল গাঁথিতে বসিল। বালক তাহাকে কুসুম হার প্রস্তুত করিতে দেখিয়া, বৃক্ষটী আর একবার নাড়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি শেফালিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বালক সানুরাগে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া বালিকার সমক্ষে জড় করিল।

বালক বালিকা উভয়েরই নিবাস এক গ্রামে, এক পল্লীতে। উভয়ের বাটীতে উভয়ের যাতায়াত না থাকিলেও, দুই জনে মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু একের সহিত অন্যের আলাপ পরিচয় ছিল না। তবে নদীর ধারে খেলা করিতে বা বেড়াইতে গিয়া দেখে, এরূপ দুই চারিবার দেখা হইয়া থাকিবে। উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে খেলা করিত—পরস্পরকে দেখিত; কিন্তু কথা-বার্ত্তা এপর্য্যন্ত হয় নাই। বালক বালিকা উভয়কেই দেখিতে সুন্দর, উভয়েরই আকৃতি গঠন ভদ্রবংশ জাত, কথাবার্ত্তাও ভদ্রোচিত, কিন্তু তাহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে আলাপ পরিচয় আছে কিনা—সে কথাও তাহারা জানে না। ফুল তুলিতে আসিয়া পরস্পর দেখা—বালিকার পুষ্পরাজি অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায়, বালক তাহাকে নিজ অংশের কতকগুলি দেওয়ায় উভয়ে কথা-বার্ত্তা হইয়াছে। বালক বালিকার ভাব হইতে অধিকক্ষণ লাগে না—তাই একবার কথাবার্ত্তা হওয়ার পরই, অল্পক্ষণেই উভয়ের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। বালকের নিকট অনুগৃহীতা হইয়া বালিকা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ পুষ্পহার গ্রথিত করিতেছে। রাশীকৃত পুষ্প পাইয়া বালিকা স্বল্পক্ষণে এক ছড়া গাঁথিতে বসিয়া—দুই ছড়া হার গাঁথিয়া ফেলিল। বালক তাহা লক্ষ্য করিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা,

"মুলুকচাঁদ" ৫ পৃষ্ঠা।

ভাই, একছড়া ফুলের মালা গাঁথিতে—দুই ছড়া গাঁথিলে কেন?”

“এতগুলি ফুল পাইয়াছি, এক ছড়া গাঁথিয়া—অনেকগুলি ছিল, তাই ভাবিলাম—আর এক ছড়া গাঁথায় দোষ কি?”

“আচ্ছা মালাতো গাঁথা হইল, এখন এ মালা লইয়া কি করিবে?’

“আবশ্যক না থাকিলে কি আর গাঁথিয়াছি? তুমি আমাকে অযাচিতভাবে এতগুলি ফুল দিতে পারিলে—আর আমি তোমায় এক ছড়া মালা দিতে পারি না?” এই কথা বলিয়া, বালিকা দুই ছড়া মালা বালকের গলদেশে পরাইয়া দিল। সাগ্রহে বালক গ্রীবাদেশে পুষ্পহার দুই ছড়া গ্রহণ করিয়া, পরক্ষণে এক ছড়া বালিকার গলদেশে পরাইল।

বালিকাপেক্ষা বালক চতুর, সে একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “একি মালা বদল হইল যে!” তদুত্তরে বালিকা বলিল, “খেলায় ছলে—ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথা, ফুলে ঠাকুর পূজা হয়, কুড়ান ফুল দেব সেবায় তো লাগিবে না। আমার অপেক্ষা তোমার বয়স বড়, তুমি ফুল কুড়াইলে—আমাকে দিলে—তুমি আমার পূজ্য—তাই মালা দুই গাছি তোমায় পরাইয়া দিলাম, তুমি—”

বালিকার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে, বালক উত্তর করিল, “এত কষ্ট করিয়া দুই ছড়া মালা গাঁথিলে, আর আমি দুই ছড়া একা পরিব? তাও কি হয়? চারটী কুড়ান ফুল তোমায় দিয়াছি, তাহাতেই মালা গাঁথিয়া তুমি ফেরত দিলে—তাই আমাকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে, তবে তুমি যাহা আমাকে, সাদরে দিয়াছ, তাহা আমি গ্রহণ না করিলে, ভাল দেখায় না—

তুমি আমায় যাহা দান করিয়াছ—আমি লইয়াছি—আমার মালাটী তুমি লও ?"

"তোমার মালা আমিতো সাদরে গলায় পরিয়াছি, তুমি যখন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ—দেবতার জিনিষ তোমায় দিয়া আমি তুষ্ট—ফুল পাইলে মালা গাঁথিতে কি আর কষ্ট হয় ? মেয়েমানুষ সাজাইতেই ভালবাসে, ফুলের মালায় তোমাকে দেখাইতেছে বেশ, তাই তোমাকে সাজাইয়াছি—এক ছড়া কেন, দুই ছড়া পরিলে—আরও সুন্দর দেখাইত।"

"আমাকে সুন্দর দেখিলে কি তোমার আহ্লাদ হয় ? ভাল—যদি তুমি আমায় সুন্দর দেখিলে সুখী হও, আর আমি কি তোমায় সজ্জিতা দেখিলে—আহ্লাদ করিব না ?"

উভয়ে এইরূপ কথা কহিতে কহিতে যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল, বালিকার অঞ্চলের ফুল অঞ্চলে রহিল, বালক কোঁচার মুড়ায় যে ফুল বাঁধিয়া ছিল, তাহাও সেইরূপ থাকিল। উভয়ের গলদেশে পুষ্পহার সুন্দর শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তিমন্দির ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবে যখন যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখন তাহারই খ্যাতি প্রতিপত্তির বৃদ্ধি পাইয়াছে। একের পতনে অন্যের উন্নতি, এই ধারাবাহিক হ্রাসবৃদ্ধির ও পরিবর্ত্তনের লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তৎকালে ইংরাজ বণিক

দেশেও এদেশে পদার্পণ করেন নাই, তবে ভারতে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল ও শাসন প্রণালীর কথঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছিল। বৈরনির্য্যাতনের সবিশেষ কারণ না থাকিলেও বলীয়ান হীনবলের প্রতি অত্যাচার করিত—সে অমানুষিক আসুরিক পীড়নে কেবলমাত্র লোকে যে নিঃস্ব হইয়াছিল, এরূপ নহে—অনেককেই ধনে প্রাণে মজিতে হইয়াছিল।

রত্নগর্ভা আর্য্যভূমিতে মণিমাণিক্যের অভাব ছিল না। বিশিষ্ট লোক মাত্রেই এই সকল অমূল্য রত্নরাজির অধিকারী ছিলেন। লুণ্ঠন ব্যবসায়ীগণ অন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিত, তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের প্রাণ হন্তারক পর্য্যন্ত হইত। "জোর যার মুল্লুক তার" এই ঘোর অরাজকতা—সে সময়ে আর্য্যভূমিতে দেখা দিয়াছিল। স্বদেশের প্রতি বীতানুরাগ ও স্বজাতির প্রেম বৈলক্ষণ্যই এই মহানিষ্টের মূল কারণ।

যখন যে ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখনই সে আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখাইয়াছে; কিন্তু সে বলবীর্য্য, সে দাম্ভিকতা ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুচিয়াছে। গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হইয়া যায়, একের উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব—তাহাও চিরস্থায়ী নহে। অন্যায় করিয়া এক জনের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলাম, তাহাকে পুত্র কলত্র সহবাসে বঞ্চিত করিলাম, আক্রান্তকে পথের ভিখারী করিয়া ধন ঐশ্বর্য্য লাভে আপনার উন্নতি হইল, বহু কর্ম্মচারী আজ্ঞাধীন থাকিল, জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি অচিরে বাড়িল, কিন্তু সে সুখভোগ কতক্ষণের জন্য? পর মুহূর্ত্তে আর একজন আসিয়া

আমাকে আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম ও পূর্ব্ব সঞ্চিত ছিল, বলপূর্ব্বক তৎসমুদয় কাড়িয়া লইল; ইতি-পূর্ব্বে অত্যাচার করিয়া আমি যাহাকে নিঃস্ব করিয়াছিলাম, অবি-লম্বে তাহার অবস্থায় আমাকে পরিণত হইতে হইল। সংসারের নিয়মই এই—দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার ক্ষণস্থায়ী; জগতে বিপুলবিক্রমশালী হীনবলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া কদাচ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, অবশ্য সময়ে তাহাকে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছে।

আলাউদ্দীন খাঁর প্রবল প্রতাপ এক সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরোত্তর জয় লাভে বহু লোক তাঁহার শরণাপন্ন, আদেশ মাত্রেই তাহারা তাঁহার সপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। দুর্জ্জয় শত্রুর সমকক্ষ হইতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। বৈরনির্য্যাতনের সঙ্কল্প থাকিলেও, উৎপীড়িত ব্যক্তি প্রাণের দায়ে, মর্ম্মাহত অবস্থায়, তাঁহারই কৃপাভিখারী হইয়া সঙ্কুচিত চিত্তে কালযাপন করিত। জয়োল্লাসমত্ত আলাউদ্দীন অন্যায় অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না; সতীর সতীত্ব নাশ, মানীর অপমান, ধনীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন প্রভৃতি যাবতীয় কলুষিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাচ বিচলিত হইতেন না। আপনার বিলাসভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হইলেই, চরিতার্থ হইত; ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত কোন দিকেই তাহার লক্ষ্য ছিল না। ছলে বলে, কলে কৌশলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই, সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সংসারীর আতঙ্কের কারণ। পুত্র কলত্র

লইয়া লোকে সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে, অকস্মাৎ কোথা হইতে কেহ আসিয়া তাঁহার সে সুখের হন্তারক হইলে, সঙ্গে সঙ্গে সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া দিলে, ভবিষ্যতের আশা ভরসা আর কিছুই থাকে না। বিজয়পুরাধিপতি চৈৎ সিং ক্ষত্রিয় সন্তান। আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও, স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয় প্রতাপ তখনও সম ভাবেই ছিল; ধন সম্পত্তির অভাব প্রযুক্ত বলবিক্রমে হীন হইলেও ক্ষত্রিয়সন্তান ধমনীতে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকিতে, অন্যের বশ্যতা স্বীকারে অপমান জ্ঞান করিত, সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জনে তাহারা প্রাণ থাকিতে পশ্চাৎপদ হইত না, পরাধীনতায় জীবন্মৃত বোধ করিত! যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লান বদনে প্রাণ হারাইবে, তথাচ বিপক্ষের কৃপাপ্রার্থী হইয়া এক দণ্ড প্রাণ রাখিবে না—ইহাই ক্ষত্রিয়েরা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিত।

মুসলমানের আধিপত্যে ক্ষত্রিয় নিস্তেজ ও হীনবল হইলেও 'ক্ষত্রিয়' নাম তখনও ভারতে লুপ্ত হয় নাই। ক্ষত্রিয় ভূপতি মাত্রেই স্ব স্ব আধিপত্য অক্ষুণ্ণ অটুট রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এক সময়ে যাঁহাদের ইঙ্গিত মাত্রে "ডিম্ ডিম্"রবে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়সেনা জয়োল্লাসে বিপক্ষের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইত, যাঁহাদের বিকট হুঙ্কারে ভুবন গগন কাঁপিয়া উঠিত, এখন সেই ক্ষত্রিয়—সেই সহানুভূতির অভাবে, সেই সাধের রণ সম্মিলনে মিলিত হইতে পায় না। অবস্থা বৈষম্যে, দেশ কাল পাত্র ভেদে ক্ষত্রিয় ভূপতি নির্দ্দিষ্ট সৈন্য লইয়া স্বরাজ্য রক্ষা করেন, বিপক্ষ পক্ষ প্রবল হইলে, আর তাঁহার সে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা হয় না, তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সাধ আহ্লাদে চির বিসর্জ্জন দিয়া ভবিতব্যে নির্ভর

করিতে হয়! নৃপতি চৈৎ সিং ঐশ্বর্য্য হীন হইলেও, তাঁহার বংশ মর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল, তৎসাময়িক অন্যান্য রাজন্যবর্গের নিকট তিনি যথেষ্ট সম্মানান্বিত ছিলেন, কিন্তু লোক বল অভাবে তাঁহাকে অনেক বিষয়েই সঙ্কুচিতভাবে কালক্ষেপ করিতে হইত।

এদিকে জয়োন্মত্ত আলাউদ্দীনের রাজ্য লাভ পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয় পতাকা লাভ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যার সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আলাউদ্দীন বিজয়পুর আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ভূপতি চৈৎ সিং আক্রমণকারীর সহিত সম্মুখ সমরে পরাজয় স্থির জানিয়াও, স্বদলবলে অরাতির গতিরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। আততায়ী বিপুল বিক্রমে বিজয়পুর অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিতেছে, এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বে জানিলেও কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, উপস্থিত জাতীয় মনোমালিন্যে অন্যের সহায়তা অসম্ভব জানিয়া, নগর রক্ষার্থ যে কয়েকজন সৈন্য নিয়োজিত ছিল, তাহাদের লইয়াই তিনি অরাতির গতিরোধে উদ্যোগী হইলেন।

হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য উভয় দিক হইতে অগ্রসর, পক্ষ বিপক্ষের সমাবেশে অধিক বিলম্ব হইল না। কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়পক্ষে সংগ্রাম বাধিল। মুসলমানগণ নগর লুণ্ঠনে আসিয়াছে, হিন্দুগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে জন্মভূমির রক্ষাই মূলমন্ত্র জানিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ, উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য পৃথক হইলেও পক্ষ বিপক্ষ সোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে তৎপর হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ পণে যুদ্ধ করিতেছে। কোন গতিকে অরাতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ

করিতে পারিলে—তাহাদের পূর্ব্বগৌরব রক্ষা হয়, আত্মীয় স্বজন লইয়া সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে, এ জন্য যথাসাধ্য বিপক্ষের অনিষ্টাচরণে তাহারা কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। চৈৎ সিং মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ বিজাতীয় অগণ্য সৈন্যব্যূহের সম্মুখীন হইয়াছেন, অল্প সময়ের মধ্যে উভয়পক্ষের বহু সৈন্য কালকবলে পতিত হইল, হতাহতের সংখ্যায় সংগ্রামস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মুসলমান শিবিরে যোদ্ধার অভাব নাই, একের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল, পিপীলিকার সারের মত তাহারা ধাবিত, সুতরাং তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। অল্পসংখ্যক মাত্র হিন্দু সেনা বিপক্ষ সহ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, অনেকেই চির নিদ্রায় নিমগ্ন হইল, আহত সৈন্যপুঞ্জ স্বদেশের রক্ষার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। যে কয়েকজন মাত্র জীবিত রহিল, তাহারা এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িল যে,তাহাদের অগ্রসর হইতেও সামর্থ্যে কুলাইল না। অগত্যা হিন্দু শিবিরে জয় লাভের আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, ভগ্ন-মনোরথ চৈৎ সিং আপনাকে সম্পূর্ণ অক্ষম জানিয়াও আততায়ীর নিকট মস্তক অবনত করা অপেক্ষা সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সহস্রগুণে গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় স্থির ভাবিয়া, এতক্ষণ সম্পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতেছিলেন, উত্তরোত্তর স্বীয় পক্ষ নস্তেজ ও হীনবল হইয়াছে সম্যক বুঝিয়া, একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলেন। চৈৎ সিংএর মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত না হইলেও, সে দৃষ্টিতে যেন প্রকাশ পাইল—ভগবান্! আমার

ইহাতে কোন অপরাধ নাই, ক্ষত্রিয় সন্তান সম্মুখ সমরে জীবন উৎসর্গ করিবে—এ কর্ত্তব্য পালনে সুখ্যাতি নাই—মৃত্যুতে আমি ভীত নহি; কিন্তু আমার কি করিলে নাথ! দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার এতো তোমার ধর্ম্ম নহে! নিষ্ঠুর অনার্য্যের কখনতো কোন অনিষ্ট করি নাই, তাহার সহিত আমার কোন সংঘর্ষণও হয় নাই—সে উচ্চাভিলাষে আমার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছে—জানি—এ যাত্রা তাহার কঠোর হস্ত হইতে আমার রক্ষা নাই—শত্রুর হস্তে আত্ম সমর্পণ অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, ক্ষত্রিয় সন্তানের ধর্ম্ম রক্ষা করিব—ইহা অপেক্ষা আমার শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে? দীননাথ, অধমতারণ—চরণে আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিও।

ক্ষত্রিয়সন্তান চৈৎ সিং নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বীর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া—তিনি অরাতি নিধনে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, বিপক্ষ সাক্ষাতে এতাবৎকাল সৈন্যবর্গকে উৎসাহিত করিয়া রণস্থলে মহা কার্য্যে ব্যপৃত ছিলেন, স্বীয় সৈন্যক্ষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকালের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অনন্যোপায় হইয়া, আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখার মত সদর্পে বিপক্ষ-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। চকিতের ন্যায় ভূপতির সকল কার্য্য শেষ হইল। যে কয়েকজন অবশিষ্ট সৈন্য তাঁহার রক্ষার জন্য এতক্ষণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, সহসা ভূপতিকে বিপক্ষ শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া, তাহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। যে মুহূর্ত্তে

ভূপতি মুসলমান সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হই-লেন, তন্দণ্ডেই সেই কয়েকজন মাত্র হিন্দু সেনা তাঁহার পশ্চাৎধাবিত হইল। চৈৎ সিং কাহাকেও তাঁহার অনুগমন করিতে আদেশ না করিলেও, তাহারা সকলেই নক্ষত্রবেগে ভূপতির সাথী হইল। হিন্দু সৈন্য-শিবিরে আর একজনও থাকিল না, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাজ-সজ্জা যথায় যাহা যে ভাবে প্রক্ষিপ্ত ছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। যে কয়েকজন চলচ্ছক্তি-হীন আহত সেনা শিবিরে শায়িত ছিল, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচর্য্যার আর কেহ রহিল না। মুমূর্ষুর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে লাগিল, জল দিবার কেহ থাকিল না, আহতের আর্ত্ত-নাদে সান্ত্বনা প্রদান করিতে জনমানবশূন্য শিবির মাত্র রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোবারক আলি ইস্মাইল রাজ্যের নবাব সংসারের একজন কর্ম্মচারী। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তাঁহার পৈত্রিক জমী জমা তাঁহারই আত্মীয় স্বজনগণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক তেমন কেহ না থাকায়, মোবারক আলি পাঠদশায় দারিদ্র্যের ভীষণ চিত্র দেখিয়াছিলেন। সংসারে এক জননী ভিন্ন তাঁহার আপনার আর কেহ ছিল না, এ কারণ তরুণ বয়সেই তাঁহাকে নবাব সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। মোবারক আলি যাহা উপায় করিতেন, তাহাতে দুঃখে কষ্টে মাতা ও পুত্রের দিনপাত হইত। যৎসামান্য বেতন, সুতরাং

তাহা হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় আর কিছু করিতে পারেন নাই। দিনে দিনে মোবারক কার্য্যক্ষম হইলে, নবাব তাঁহার মাসিক বৃত্তির কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, গৃহে মাতা ভিন্ন আর কেহ নাই; কোন দিন জননী অসুস্থা হইলে, তাঁহাকেই রন্ধনাদি গৃহস্থালীর সকল কাজ করিতে হইত। যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত না হইলে, প্রভু বিরক্ত হইতে পারেন, অথচ গৃহস্থালীর সকল কাজ সারিয়া কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইলে, নবাবের কর্ম্মটী সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। এই সকল কারণে বিবাহ করিবার জন্য মাতা পুত্রকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মুসলমান গৃহে বয়স্থা কন্যার অভাব নাই। মোবারক আলি যখন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে প্রকৃত অভাব অনুভব করিলেন, মাতার অনুরোধ মত দারপরিগ্রহে তাঁহার আপত্তি রহিল না। মোবারক একটী মধ্যবিৎ অবস্থার গৃহস্থের সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

নবাব বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে মোবারকের একখানি সুন্দর কুটীর নির্ম্মিত হইল। এতাবৎকাল তাঁহাকে বাটীর ভাড়া দিয়া আসিতে হইতেছিল, এক্ষণে তিনি সেই দায়ে মুক্ত হইলেন। মোবারক-জননী পুত্রের বিবাহ দিয়া সংসার ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। রন্ধন, গৃহ পরিষ্কার প্রভৃতি সকল কার্য্যই এক্ষণে মোবারক-পত্নী ফতেমা বিবি নির্ব্বাহ করিতেন।

সংসারের শোভা পুত্র-কন্যা না থাকিলে, গৃহস্থের অভাব থাকিয়া যায়। সুখস্বচ্ছন্দে মোবারকের দিন যাপিত হইতেছে, উত্তরোত্তর চাকুরীস্থলে তিনি উন্নতি লাভ করিতেছেন, কিন্তু সন্তান সন্ততি না হওয়ায়, মোবারকের পরিবারবর্গ মনে মনে বেজ

ক্ষুন্ন হইতে লাগিলেন। অবশেষে ভগবান তাঁহাদের ব্যথার যেন ব্যথা পাইলেন, কিছুদিন পরে মোবারক আলি এক সুন্দরী কন্তার পিতা হইলেন। শশী-কলার ন্তায় সেই নবজাত কুমারী বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল, পরিজনবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

হাসি কান্না লইয়া সংসার,—সুখ দুঃখ বিজড়িত এই মানবজীবন। মোবারক-মাতা বহুকষ্টে পুত্রটীকে মানুষ করিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহ দিয়া ও পৌত্রী মুখ দর্শন করিয়া, একণে তিনি জন্ম সার্থক করিয়াছেন, ইহাপেক্ষা তাঁহার অদৃষ্টে আর কি সুখভোগ হইতে পারে? তাহার উপর মোবারক আলি এক্ষণে ভদ্রাসনের স্বয়ং অধিকারী হইয়াছেন, মাসিক উপার্জ্জনে তাঁহার গৃহধর্ম্মের কোন প্রকার অভাব হইতেছে না, বৃদ্ধা ইচ্ছামত দীন দুঃখীকে দান ও অন্তান্ত সৎকার্য্য করিতেছেন, মোবারক মাতাকে কোন কার্য্যে নিষেধ করেন না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই কর্ত্তৃঠাকুরাণীর আজ্ঞাবাহী, তাঁহার যাহাতে দৈহিক বা মানসিক কোন কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে উভয়েরই বিশেষ দৃষ্টি—বৃদ্ধা কোন বিষয়ে অমত করিলে, স্ত্রী-পুরুষের কেহই কখন সে কার্য্য করেন না; কিন্তু বৃদ্ধাকে এরূপ সুখ বহুদিন ভোগ করিতে হইল না, অকস্মাৎ তিনি গ্রহণী রোগাক্রান্তা হইলেন।

মাতার পীড়ায় মোবারক বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন ও যথাসাধ্য চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন ত্রুটি করিলেন না। অর্থব্যয়ে ও স্ত্রী-পুরুষের কায়িক শ্রমে যতদূর রোগীর ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা এবং সেবাশুশ্রূষা হইতে পারে, সাধ্যমত তাহার ব্যবস্থা করিলেন, কোন প্রকার উপেক্ষা হইল না। জন্মিলেই

করিতে হইবে—অবধারিত থাকিলেও, মাতার সংসারে পরিজনবর্গের কেহ পীড়িত হইলে, চিকিৎসা না করাইয়া অন্য সকলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পরমারাধ্যা গর্ভধারিণীর পীড়ায় মোবারক আলি সংসার যেন শূন্যপ্রায় দেখিলেন, তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অসুখ কারণ বিশেষ বিচলিতা হইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই বৃদ্ধার আরোগ্য লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের কোন উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধার অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া, স্ত্রী পুরুষ এককালে হতাশ হইয়া পড়িলেন—বৃদ্ধাকে সংসারবন্ধনে যে অধিকদিন আর জড়িত রাখিবেন, সে আশা ভরসা তাঁহাদের আর রহিল না। প্রাণপণে—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—এই ভাবিয়া পত্নীসহ মোবারক বৃদ্ধার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিলেন, কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের এত কষ্ট স্বীকার—এত সকরুণ প্রার্থনা—সমস্তই বিফল করিয়া—বৃদ্ধা ইহ সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় লইলেন।

যথাসময়ে যথারিতি প্রেতকৃত্যাদি শেষ হইয়া গেল, যাঁহার অবলম্বনে মোবারক আলি সংসারী—এক্ষণে তিনি আর নাই—বিধাতার লিখন, খণ্ডন হয় না—মনে মনে উপলব্ধি করিয়া মোবারক সংসার ধর্ম্মে সংযত রহিলেন। মোবারক-পত্নী ফতেমা স্বামীর সেবা সুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন, সুখে দুঃখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু জননীকে জন্মের মত বিদায় দিয়া মোবারক আর স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারিলেন না। সংসার, সমাজ, গৃহধর্ম্মে তিনি পদে পদে কেমন যেন অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

মায়া বিজড়িত সংসারে নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াও, প্রাণের ব্যথা প্রাণে চাপিয়া লোকের চলা ফেরা, কাজ কর্ম্ম সমস্তই করিতে হয়। শোকতাপগ্রস্থ দিবারাত্রি বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইলে, সংসার ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। একের অভাবে প্রাণে যে ব্যথার সঞ্চার হয়—অন্তের আবির্ভাবে আবার তাহার উপশম হয়—এই লইয়াই সংসার; তাহা না হইলে, কথায় কথায় লোকে উম্মাদগ্রস্থ হইত, গৃহধর্ম্ম রক্ষা হইত না। মোবারক আলি মাতৃশোকে জর্জ্জরিত, গ্রাসাচ্ছাদন, আমোদপ্রমোদ সকল বিষয়েই তাঁহার অতৃপ্তি, কিন্তু এভাবে তাঁহাকে অধিক দিন যাপন করিতে হইল না। দুগ্ধপোষ্য কুমারী একণে তাহার পিতামহীর আসন গ্রহণ করিল, মোবারক কন্যারত্নটিকে বুকে লইয়া মাতৃশোক বিস্মৃত হইলেন। আহার বিহার, ভোগবিলাসে ক্রমে তাঁহার আবার অভিরুচি হইল।

যথাসময়ে কন্যার অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে, মোবারক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া মহা সমারোহে সে উৎসব সম্পন্নকরিয়া-ছেন, মোবারকের জীবন সর্ব্বস্ব সেই কন্যাটী একণে মেহেরুন্নিশা নামে অভিহিতা হইয়াছে। কর্ম্মস্থলে অবসর পাইলেই মোবা-রক গৃহে চলিয়া আসেন, দুগ্ধপোষ্য কন্যা মেহেরুন্নিশাকে দেখিয়া, তাহাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া, কত আনন্দ উপভোগ করেন। যৎসামান্য উপার্জ্জনে তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, একারণ এখনও দশ টাকার সংস্থান করিতে পারেন নাই, কিন্তু কন্যাটীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংস্থানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। যেরূপ আয় ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল, মোবারক সে সকল খরচপত্রে কথঞ্চিৎ ব্যয়কুণ্ঠ হইলেন, কারণ

কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইলে, খরচ পত্রের জন্য কিছু সংস্থান নিতান্ত প্রয়োজন নতুবা বিবাহ হইবে না।

বাল্যকাল হইতে মোবারক অভিভাবক হীন, সুতরাং নানা দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইয়াছে, তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলেও বার্দ্ধক্যের আক্রমণ হইতে তিনি কিরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন? সংসারে স্ত্রী ও কন্যা ভিন্ন আর কেহ নাই, বার্দ্ধক্যের সূত্রপাত্রেই তিনি পুত্রী ও কলত্রের সংস্থান জন্য ব্যস্ত হইলেন। একপক্ষে কন্যাকে সুপাত্রে দান, অন্যপক্ষে তাঁহার অবর্ত্তমানে ভার্য্যাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়, এই সকল চিন্তায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিল। কর্ম্মস্থলে অবসর গ্রহণে তিনি সুস্থ ও সবল হইতে চেষ্টা করিলেন, ঔষধ ও পথ্যাদির সাধ্য মত ব্যবস্থা হইল, কিন্তু অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া চির জীবনের মত তিনি ইহ সংসার হইতে বিদায় লইলেন। চিকিৎসক ও ঔষধাদির ব্যবস্থার ক্রটি হয় নাই, কিন্তু নিয়তির হাত হইতে উদ্ধারের উপায় কোথায়? জীবদ্দশায় মোবারক আলি যে দুইটী সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছিলেন, সে দুইটীই তাঁহার অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

মেহেরুন্নিশা এক্ষণে অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। স্নেহময় পিতার লালন পালনে এতদিন তাহাকে সংসারের ভীষণচিত্র আদৌ দেখিতে হয় নাই। পিতার অবর্ত্তমানে বালিকার অবস্থা যে কি দাঁড়াইল, সে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, দিনে দিনে তাহার অপরূপ রূপলাবণ্যে কেমন একটা মলিনতা দেখা দিল।

বালিকার মনে সে পূর্ব্বস্ফূর্ত্তি নাই, অথচ তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইতেছে না।

স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে ফতেমা বিবির চিন্তার আর অবধি রহিল না। পতির উপার্জ্জনে একপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে মাসিক আয় রহিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মোবারক আলির সঞ্চয়ের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না, পরিণাম চিন্তা যে দিন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই তিনি সংস্থানে উদ্যোগীও হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সংস্থান বহুদিন করিতে হয় নাই, অকাল মৃত্যু হওয়ায় মোবারকের মনের বাসনা মনেই রহিয়া গেল। যে দুইটী প্রাণীর জন্য তিনি সঞ্চয়ে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই দুইটী অনাথা এক্ষণে মোবারকের আবাসে তাঁহার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ বাঁচিয়া রহিল। কন্যাকে লইয়া অসহায়া বিধবা রমণী ফতেমা এক্ষণে কিরূপে মানুষ করিবেন, মনোমত বর দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবেন, কাহার আশ্রয়াধীনা হইয়া তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপিত হইবে, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবনায় অহোরাত্র জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। পুরুষ মানুষ উপার্জ্জন করিয়া গৃহে লইয়া আসে, স্ত্রীলোক খরচ পত্রের ব্যবস্থা করে—এই ভাবে চিরদিন সংসার চলে। এক্ষণে আয়ের পথ রহিত হইয়াছে, যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থে মা ও মেয়ের জীবিকা, সুতরাং মেহেরুন্নিশার বেশভূষাও আর পূর্ব্বমত হইয়া উঠে না। বালসুলভ চাপল্যে কুমারী জননীর কাছে কখন কখন ভাল খাবার ও পরিবার জন্য আব্দার করে, কাঁদিতে থাকে, ফতেমা বিবি অন্য কথার উত্থাপন করিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা

করেন, ভুলাইতে থাকেন। কিন্তু বালিকার এক্ষণে কথঞ্চিৎ বুদ্ধি হইয়াছে, অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে না পারিলেও মেহেরুন্নিশা মাতার মুখের প্রতি তাকাইয়া প্রবোধিতা হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে নদীতটে পুষ্পচয়ন বিষয়ে যে বালিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই বালিকাই মোবারক আলির স্নেহের ধন মেহেরুন্নিশা। শেফালিকা পুষ্প চয়নে যাইয়া বালকের সহিত মেহেরুন্নিশার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পতিপ্রাণা হিন্দুললনার ইহজীবনে স্বামীই সর্ব্বস্ব ধন, সাধ্বী-সতী স্বামীকেই জগৎগুরু জ্ঞান করিয়া থাকেন। চৈৎ সিং-মহিষী যোৎকুমারী মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রমণের সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, বিজয়পুরাধিপতি যে আততায়ীর অবরোধে প্রতিহস্তারক হইবার অভিপ্রায়েই সৈন্য দলসহ তদভি-মুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এ কথাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। শত্রু পক্ষ মহাশক্তি সম্পন্ন, বহু সৈন্য লইয়া সদর্পে সতেজে যখন আসিতেছে—তখন অরাতির করালগ্রাস হইতে যে অপেক্ষাকৃত হীনবল রাজা নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পাইবেন—সে আশা ভরসা—দুরাশা-মাত্র। বিজয়পুর শত্রুহস্তে দলিত হইলেই তাঁহাদের মান মর্য্যাদা বংশসম্ভ্রম সমস্তই এককালে জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে। পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, পারিষদ অমাত্য, দাস দাসী সম্বলিত শোভা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিজয়পুর এককালে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। আততায়ীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যে যথায় পাইবে—আশ্রয় লইবে,

শোণিত ধারায় পথ ঘাট প্লাবিত হইবে, ভীষণ দৃশ্যে অচিরে বিজয়পুর অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিবে, পতিব্রতা স্বামী সহবাসে চির বঞ্চিতা হইবেন, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোৎকুমারী সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন।

ক্ষত্রিয় রমণী মরণের ভয়ে ভীতা নহেন। আত্মীয় স্বজনের অকাল নিধন, বিনা অপরাধে নিগ্রহ ভোগ, আয়োজন উদ্যোগ ব্যতিরেকে যৎসামান্য সৈন্যসহ স্বামীর প্রবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় আততায়ীর প্রতিরোধ সাধন, এরূপ অবস্থায় যদি বিজয়পুরাধিপতির কোন অনিষ্ট ঘটে—পতিব্রতা প্রজ্জ্বলিত পাবকশিখায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, সম্মুখ বিপদে পরিত্রাণ লাভ করিবেন—শত্রুপক্ষের অস্পর্শিয় হস্তে আত্ম সমর্পণের পূর্ব্বেই আত্মীয় ললনাগণের সহিত মিলিতা হইয়া তাহাদের বিপক্ষতাচরণে যথাশক্তি উদ্যোগী হইবেন; নিরুপায় অবস্থায় প্রাণের মায়া মমতা ভুলিয়া, অনল শিখায় প্রবেশ করিয়া, মহা নিদ্রায় নিমগ্না হইয়া চরশান্তি উপভোগ করিবেন—ঘোৎকুমারীর ইহাই প্রাণের কথা—প্রাণ থাকিতে ক্ষত্রিয়কুমারী কদাচ শত্রুপক্ষের আয়ত্তাধীন হইবেন না—ইহাই ক্ষত্রিয়-ললনার দৃঢ় সঙ্কল্প ও ধর্ম্ম।

যুদ্ধের সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত না হইলেও রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, প্রতিপক্ষ মহাসমারোহে বহু সৈন্য লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের আক্রমণ হইতে এ যাত্রা রক্ষা হওয়া সম্ভব নহে, রাজপত্নী মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ইতিপূর্ব্বেই সহচরী ও আত্মীয়গণসহ পরামর্শ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘোৎকুমারীর সংসারের সাধ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে, দ্বাদশবর্ষীয়

বালক সুকুমার মুলুকচাঁদ তাঁহার একমাত্র গর্ভজাত সন্তান, সেই বালকই বিজয়পুরাধিপতির একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী। মহিষীর মুলুকচাঁদই জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের মণি। যোৎকুমারী কত উচ্চ আশা বুকে লইয়া সেই বালকের লালন পালনে এতাবৎকাল যত্ন লইতে ছিলেন! মুলুকচাঁদই বিজয়পুরের শোভা, কুমারের চন্দ্রানন অবলোকন করিয়াই রাজা ও রাণী উৎফুল্ল হৃদয়ে পূর্ণ উৎসাহে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন। কুমারকে লইয়া তাঁহাদের সকল সাধ আহ্লাদ মিটিবে, এইরূপ মনে মনে কত কামনা করিয়া নৃপতি ও মহিষী দিন পাত করিতেছিলেন। আমোদ প্রমোদের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে সমর-ক্ষেত্রে যদি কোন অনিষ্টের সংঘটন হয়, তাহা হইলে জীবনের মত সকল আমোদ উৎসব শেষ হইয়া যাইবে। রাজমহিষী ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, অথচ নয়নাসারে সতীর বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় বসিয়া আছেন, এমত সময়ে তাঁহার এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহারাজ স্বয়ং শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রমণী দাসীর মুখে স্বামীর যুদ্ধ সমাচার পাইয়া সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কতক্ষণ গিয়াছেন? তিনি যাইবার পর আর কোন সংবাদ আসিয়াছে কি না?"

দাসী বলিল, "দেবি! এই মাত্র তাঁহার শত্রু শিবিরে প্রবেশের সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার পরের সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।" বিপদ সম্মুখীন জানিয়া যোৎকুমারী অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন!—এক্ষণে তাঁহার চক্ষু হইতে আর অশ্রুধারা

বিগলিত হইতেছে না, তিনি আত্মীয় ও পরিচারিকা বর্গের সহিত বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিতা হইয়া পতির সাক্ষাৎ উদ্দেশে বহির্গত হইয়া পড়িলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি যুদ্ধে জয় লাভ হয়, তাহা হইলেই ভূপতিসহ প্রাসাদে পুনঃ প্রবেশ করিবেন, নতুবা ইহ জীবনের মত সংসারের মায়া মমতা সকল বন্ধন ছেদ করিয়া তিনি স্বামীর সহগমন করিবেন। জীবন-সর্ব্বস্ব রাজকুমার মুলুকচাঁদের চাঁদমুখ দর্শন জনিত মায়ার বন্ধনে তাঁহার মন আর বিচলিত হইল না। তিনি গন্তব্যপথে সত্বর ধাবিতা হইলেন।

আক্রমণকারী আলাউদ্দীন খাঁ সাজ সরঞ্জমে অস্ত্রশস্ত্রে সম্যক বিভূষিত হইয়া বহু সৈন্যসহ বিজয়পুর আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। মুসলমান সৈন্যাপেক্ষা ক্ষত্রিয় বীর অমিত তেজসম্পন্ন হইলেও, সংখ্যায় ন্যূনতা প্রযুক্ত এ যুদ্ধে হিন্দুর জয় লাভের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, শত্রুপক্ষের আয়ত্তাধীন হইবার পূর্ব্বেই ক্ষত্রিয়গণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে—বিজেতার জয় পতাকা উড্ডীন হইতে দেখিবে না। প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয় বীর 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'—এই দৃঢ় বিশ্বাসে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে, জয়ের আশায় নৈরাশ হইলেও বিজয়পুরবাসী সাগ্রহে ভূপতির সংবাদের জন্য উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে।

এক পক্ষে রাজ্যবৃদ্ধির লালসা, অন্য পক্ষে বিজাতীয় আক্রমণ হইতে স্বদেশের রক্ষা সাধন; পক্ষ বিপক্ষ উভয় দলই দ্বিগুণ উৎসাহে, বিপুল বিক্রমে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল, দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। একে শত্রুর পীড়ন, তাহাতে সৈন্যক্ষয়, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া চেৎসিং এককালে অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিলেন; মহারথী বিজয়পুরাধিপতি এক্ষণে শক্তি ও সহায় হীন—তাঁহার বাহুতে এরূপ বল ছিল না যে, তিনি অস্ত্রধারণ করিয়া বিপক্ষের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন। শত্রুর বারম্বার অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা বহিয়াছিল, তথাচ সমভিব্যাহারী কয়েকজন সৈন্যসহ তিনি মুসলমান শিবিরস্থ সৈন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু সে প্রতিরোধ কতক্ষণের জন্য? যে কয়েকজন হিন্দু সৈন্য বিজয়পুরাধিপতির সহায়তায় আলাউদ্দীনের সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিল, একে একে তাহারা সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। চৈৎ সিংকে এককালে সম্পূর্ণ অসহায় জানিয়া আলাউদ্দীন জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না! চৈৎ সিং আপনাকে নিঃসহায় জানিয়াই, বিজাতীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সহচরগণের যে দশা ঘটিল, তিনিও তাহাদের সহিত সেই চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ইহজীবনে সে নিদ্রা আর ভঙ্গ হইবার নহে! জয়োন্মত্ত আলাউদ্দীন বিজয়পুরাধিপতির নিধন বার্ত্তা কর্ণগোচর হইবামাত্র সর্ব্বাগ্রে রাজপুরী লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হইলেন, মুসলমান সেনা অনেকেই তাঁহার অনুগামী হইল। সমরক্ষেত্র যোদ্ধাবর্গের শব দেহ বক্ষে ধরিয়া বিকট শ্মশানমূর্ত্তি ধারণ করিল, ক্ষণপূর্ব্বে যে স্থান সৈন্য কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান নীরব নিস্তব্ধ - বৃক্ষের শুষ্কপত্র খসিয়া পড়িলে, সে শব্দ পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যোৎকুমারী বিজয়পুরাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে স্বদলবলে সুসজ্জিত হইয়া সোৎসাহে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়-ললনার লজ্জা ভয় মান সম্ভ্রম কোন দিকে

তখন লক্ষ্য ছিল না! সিংহিনী যেন সদলবলে আহত সিংহের সাহায্যার্থ বাহির হইয়াছিল। রমণীর সে তেজোময়ী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দর্শনে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে! সঙ্গিনীসহ যোৎকুমারী সেই ভীষণ রঙ্গভূমিতে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া ইতস্ততঃ স্বামীর মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দলে দলে হিন্দু সৈন্যের মৃতদেহ ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে, রুধির স্রোতে রণক্ষেত্র প্লাবিত! পালে পালে শকুনি গৃধিণী প্রভৃতি মাংসাসী পক্ষিগণ তথায় বিচরণ করিতেছে, চারিদিকে ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিতে করিতে সানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, কোথাও বা অস্ত্রাহত সৈন্যের হৃদয় বিদারক বিকট চীৎকার—ভীষণ সমরক্ষেত্র অধিকতর বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে ভৈরব কোলাহল—চারিদিকেই ভীষণ অমানুষিক কাণ্ড হঠাৎ দেখিলে, বীরগণের হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হয়—কিন্তু পতিব্রতা যোৎকুমারীর কোন দিকে লক্ষ্য নাই—বেগবতী নদী যেমন সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাগর উদ্দেশে ধাবমানা হয়, সেইরূপ রণক্ষেত্রের এই ভয়াবহ দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, সাধ্বী স্বামীর উদ্দেশ্যে এক মনে চলিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যোদ্ধৃবর্গের দেহরাজি পাঁতি পাঁতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু কোথাও বিজয়পুরাধিপতির দেহ দেখিতে পাইতেছেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মহিষী অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু নৃপতির কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে সম্মুখে যবন শিবির তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। মুসলমান সৈন্যের জয়োল্লাস জনিত বিকট

চীৎকার মহিষীর কর্ণগোচর হইল, সে শব্দে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই শিবিরাভিমুখেই তিনি ধাবিতা হইলেন। রণ-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন— এমন সময়ে ধূলি বিলুণ্ঠিত চৈৎ সিংএর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ রাণীর দৃষ্টি-গোচর হইল। বিষাদপূর্ণা যোৎকুমারী মৃতপতির মুখের প্রতি ক্ষণকাল অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, দর দর ধারে পতিব্রতার নয়নধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, অশ্রুধারায় সতীর বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। সহচরী রমণীবৃন্দও মহিষীর রোদনে যোগ দিল, সকলেই বিষাদময়ী!

পতির সাক্ষাৎ কামনায় সতী অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি বিধর্মীর নিকটস্থ হইতেও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই, অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতক্ষণে তাঁহার সে আশালতা চিরতরে নির্মূলিতা হইল; চৈৎ সিংএর মৃত্যুর সহিত রাণীর সকল সাধ আহ্লাদ জন্মের মত ঘুচিয়া গেল। তিনি মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই সঙ্গিনাসহ আসিয়াছিলেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন যে, যদি স্বামীসহ আসিতে পারেন, তাহা হইলেই রাজপুরীতে পুনঃপ্রবেশ করিবেন, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি বাম হইয়াছেন, তাহার সে সাধে ভগবান বাদ সাধিয়াছেন। এক্ষণে সহমরণ ভিন্ন সতীর অন্যগতি নাই। ক্ষত্রিয়াঙ্গনাগণ সেই সজ্জারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, চৈৎ সিংএর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইল। রাশি রাশি কাষ্ঠ সংগৃহীত ও সত্বর চিতা সজ্জিত হইল। স্বামীশোক বিহ্বলা পতিপ্রাণা যোৎকুমারী স্বহস্তে মৃত পতির দেহ চিতায় সযত্নে শায়িত করিয়া, অগ্নি

সংযোগ করিয়া দিলেন, পরক্ষণে স্বয়ং সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি স্বরূপ হইলেন, সঙ্গিনী রমণীবৃন্দও বিধর্ম্মীর হস্তে নিগৃহীতা হইবার ভয়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া, একে একে সকলেই রাণীর পথ অনুসরণ করিল।

দূর হইতে মুসলমান সৈন্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ল-নেত্রে ক্ষত্রিয়-ললনাদিগের কার্য্য কলাপ সচকিত নয়নে অবলোকন করিতেছিল তাঁহাদের অপরূপ রূপলাবণ্যে ও এই অপূর্ব্ব আত্মবলিদানে উদ্যোগ দর্শনে, তাহারা এরূপ মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল যে, নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিল, কাহারও মুখে একটী কথাও নিঃসৃত হয় নাই। রমণীগণ যে সময়ে সমরক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া মুসলমান শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হয়, সে সময়ে দুই চারিজন যবন সেনা তাঁহাদের গতি বিধি লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু সে নারীপুঞ্জের সদর্প ভাবভঙ্গি দেখিয়া, তাহারা প্রতিরোধ করিতে কেহই সাহসী হয় নাই। ক্ষত্রিয় রমণীগণের যথাযথ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না।

আলাউদ্দীন সদর্পে বিজয়পুরাধিপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সোৎসুকনয়নে চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও পুরবাসিনীগণের সন্ধান পাইলেন না। তখন বুঝিলেন যে, শিবির সম্মুখে বীর সাজে সজ্জিতা যে রমণীগণ তাঁহার নয়ন-গোচর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই অন্তঃপুর শূন্য করিয়া গিয়াছেন। রাজপুরীর অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় যেন কাঁদিয়া উঠিল। আলা অনেক আশা বুকে ধরিয়া রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, রমণীগণের সাক্ষাৎ অভাবে তাঁহাকে নৈরাশ হইতে হইল। পূর্ব্বেই তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছিল যে, জীবিতাবস্থায়

ক্ষত্রিয়রমণী কিছুতেই তাঁহার আয়ত্তাধীন হইবে না, ইতিপূর্ব্বেই স্বচক্ষে তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ কতক পরিমাণে অবলোকন করিয়াছিলেন, অগত্যা মনের আক্ষেপ মনেই তাঁহাকে সম্বরণ করিতে হইল। তিনি বুঝিলেন যে, ক্ষত্রিয় ললনা সহজে বিধর্ম্মীর হস্তগত হইবার নহে!

আলার সহচর সৈনিকবর্গ রাজপুরী লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ভূপতির নিযুক্ত যে কয়েকজন প্রহরী প্রাসাদ রক্ষা করিতেছিল, আগন্তুকদিগের অবরোধ হইতে পুরী রক্ষার চেষ্টা পাইয়া, তাহারা সকলেই একে একে নিধনপ্রাপ্ত হইল। বিজয়পুরাধিপতির যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াও কিন্তু আলাউদ্দীনের মনোরথ পূর্ণ হইল না, তাঁহার হৃদয়ে যেন কি এক গুরুতর অভাব রহিয়া গেল!

প্রাসাদ হইতে নিক্রান্ত হইবার সময়ে, তিনি মুলুকচাঁদকে দেখিতে পাইলেন। মুলুক দ্বাদশবর্ষীয় বালক, বহুমূল্য সুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত, তাহার মনোমোহনরূপে দর্শকমাত্রেই মোহিত হয়। সে বালকটী কে, সবিশেষ কোন পরিচয় না পাইলেও, আলাউদ্দীন এককালে তাহার হাত ধরিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি মুলুকচাঁদের হস্ত ধারণ করিলে, বালক তাহার হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা পাইল; কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার সদয় ব্যবহারে আর কোন আপত্তি করিল না। সরল মতি মুলুকচাঁদ, বিজয়-পুরাধিপতির এক মাত্র বংশধর, ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার যে কি শোচনীয় অবস্থা হইল, রাজ্য ধন বিষয় সম্পত্তির এক মাত্র অধি-কারী হইয়াও তাঁহার আপনার বলিতে যে কিছুই রহিল না, সে কথা বালক কিছুই বুঝিতে পারিল না। অকস্মাৎ আলাউদ্দীনের করস্পর্শে বালক কুপিত হইয়াছিল, প্রতিরোধের চেষ্টাও পাইয়া-

ছিল! রাজকুমারের হিতাহিত বিবেচনা শক্তির তখনও ভাল বিকাশ হয় নাই, সহসা এরূপ ব্যাপারে সে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিল, অনিষ্টের আশঙ্কায় তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বর্ষিত হইয়াছিল। নির্দ্দয় আলাউদ্দীন বালকের রোদন উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুচরবর্গকে অভিপ্রায় জানাইলেন, মুলুকের সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব ও দেববালক সদৃশ সুকোমল প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে, আলাউদ্দীন আত্মহারা হইয়াছিলেন। বালকের প্রতি তাঁহার এরূপ করুণাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল যে, মুলুক আলার সাদর সম্ভাষণ উপেক্ষা করিলেও, তিনি স্নেহ বশতঃ তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। বালক আলাউদ্দীনের সে অভিপ্রায়ের অন্যথা করিতে পারিল না, সিংহশাবক ফেরুপাল কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, বিজয়পুরাধিপতির বংশগৌরব চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইল!

পিতা মাতার স্নেহ যত্নে লালিত পালিত হতভাগা মুলুকচাঁদ এই বাল্যকালেই বিজাতির অধীন হইল। এতদিন রাজ কুমারের আদেশ মাত্র সকল কার্য্য অসংখ্য দাসদাসী কর্ত্তৃক অনতিবিলম্বে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, অদৃষ্ট দোষে এক্ষণে সেই বিজয়পুরাধিপতির অতুল স্নেহের পাত্র—বংশের দুলালকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইল! পিতৃহন্তা বিধর্ম্মীর কৃপার ভিখারী হইয়া মুলুকচাঁদকে সেই পাপমতির আশ্রয়েই দিন যাপন করিতে হইবে। অবোধ বালক অদৃষ্টে যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, শত্রুপক্ষের আয়ত্তাধীন হওয়ায় আত্মীয় স্বজনে চিরবঞ্চিত হইল, স্বাধীন রাজকুমারকে বাল্য-কালেই পরাধীনতা-নিগড়ে চিরবদ্ধ হইতে হইল। আলাউদ্দীন

তাঁহাকে স্নেহ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও, ধর্ম্ম বিদ্বেষে অবশ্য অবজ্ঞা করিবেন! আর্য্যসন্তান অনার্য্যের অন্নভোজী, ইহাপেক্ষা মুলুকচাঁদের অদৃষ্টে আর কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে?

বহুমূল্য রত্নরাজি ও অন্যান্য দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহে সসৈন্য আলাউদ্দীনের অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি রাজপুরী শ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। আলাউদ্দীন বালকটীকে সঙ্গে লইয়া বিজয়পুর প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। সৈন্যবর্গও জয়োল্লাসে "আল্লা আল্লা হো!" ধ্বনি করিতে করিতে অল্পক্ষণে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। বিজয়পুরাধিপতির অট্টালিকায় সন্ধ্যার বাতি প্রদানের জন্যও একটী প্রাণী জীবিত রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিশুকালে খেলার ছলে বালকবালিকার মিলন হয়। প্রথম মিলনের পর খেলিবার জন্য দ্বিতীয়বার উভয়ে দেখা। এইরূপ বারবার মিলনে পরস্পরের মন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। খেলার সাথিগণের মধ্যে এইরূপ প্রণয় সরল ও স্বর্গীয়; এ প্রণয়ে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। তাহার উপর যদি একটী বালক ও অপরটী বালিকা হয়, তাহা হইলে এই বাল্যকালের খেলাঘরের সরল ভালবাসা উভয়ের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাময় ভালবাসায় পরিণত হয়। এ ভালবাসাও সরল ও স্বর্গীয়। ধুলামাটীর খেলাঘর ছাড়িয়া, তখন

জগতের ঘটনাবৈচিত্র্যময় বৃহত্তর খেলা ঘরে উভয়ে অবিচ্ছিন্ন এ জীবনব্যাপী "খেলার সাথিত্ব" সূত্রে গ্রথিত হইয়া প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হয়। কাহারও ইচ্ছা পূর্ণ হয়—কাহারও হয় না।

নদীসৈকতে জেলালের সহিত মেহেরুন্নিশার প্রথম সাক্ষাৎ। পরস্পর কথোপকথনে বালিকার মনোভাব বিচলিত না হইলেও, জেলালের মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় বালক সে আকর্ষণের মর্ম বুঝিতে পারে নাই। কেবল বুঝিয়াছিল—মেহেরকে দেখিবার অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে খেলার ছলে উভয়ের সাক্ষাৎ; সেই ক্ষণকালের জন্য পরস্পরের দর্শনে পরস্পরে সুখী হইত। এইরূপ খেলার ছলে বৎসরের পর তিন চারি বৎসর গেল, সেই নদীতীরে প্রত্যহ উভয়ের মিলন হইত—প্রত্যহ উভয়ে খেলা করিত, কিন্তু কেহ কাহারও বাসস্থান জানিত না। ইহার পর নানাকার্য্যে পড়িয়া উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল এইরূপ অদর্শনে আরও চার পাঁচ বৎসর অতীত হইল। তখনকার বালক-বালিকা এক্ষণে যুবক, যুবতী—একের বয়স অষ্টাদশ—অপরের ত্রয়োদশ, উভয়েরই বালস্বভাবসুলভচপলতা গিয়া যৌবনের প্রারম্ভে যে মধুর গাম্ভীর্য্য আসে, সেই গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে। এইরূপ কয়েক বৎসর অতীত হইবার পর বাসস্থান না জানিলেও, বালিকার জন্য জেলাল ব্যাকুল, যতক্ষণ না তাহার সাক্ষাৎ পাইতেছে, জেলাল কিছুতেই শান্তি বোধ করিতেছে না। বহু অনুসন্ধানে মেহেরুন্নিশার বাসস্থানের নির্দ্দেশ হইল, জেলাল উদ্বিগ্নচিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব কতক্ষণের জন্য? মেহেরুন্নিশার কথা সে যতই

ভাবিতে থাকিল, উত্তরোত্তর তাহার প্রাণে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়িতে লাগিল! এই ভাবেই কয়েক দিবস কাটিয়া গেল, তাহার দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত হইল না। জেলাল মেহেরুন্নিশাকে দেখিবার জন্য মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল;—বাল্যকালের সুপ্ত প্রণয় এতদিন পরে নূতন আকার ধারণ করিয়া আবার জাগিয়া উঠিল। যাহারই কথা লইয়া যুবকের অহোরাত্র চিন্তা, একাগ্রচিত্তে যে যাহার কামনা করে, তাহার সে সাধ অপূর্ণ থাকে না!

আলুলায়িতকেশে মোহরেক-চুম্বিতা এক দিবস বহির্বাটীর ছাদে মধ্যাহ্ণ তপনরশ্মি উপভোগ করিতেছে, তাহারও বদন চিন্তাকুল—তাহারও মনে আকাঙ্ক্ষাময় প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, অনন্যমনে সে জেলালের চিন্তা করিতেছে—এমন সময় অকস্মাৎ জেলালউদ্দীন বালিকার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। চারি চক্ষের অকস্মাৎ মিলনে উভয়েরই মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—কি যেন এক অজানাভাবে উভয়েরই প্রাণের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল। যুবক অপেক্ষা বালিকার সলজ্জভাব, পরস্পর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না; জেলাল দেখা করিবার অভিপ্রায়েই কয়েক দিবস বালিকার সন্ধান লইতেছিল, তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছিল—কিন্তু যখন দেখা হইল—আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। কি যেন অজানাভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল—কি এক অজানা শক্তি যেন মুখ চাপিয়া ধরিল! বালিকার সচকিত-ভাবে জেলাল এমত আত্মবিহ্বল হইয়াছিল যে, কোন কথা কহিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। এই ভাবেই সে দিন

কাটিয়া গেল, জেলালের মনোরথ সম্পূর্ণ সফল না হইলেও, সে তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করিল।

নদী সৈকতের বাল্যক্রীড়ার সাথি বলিয়া চিনিতে পারিলেও লজ্জা ভয়ে জেলালের সমক্ষে মেহেরের মুখ হইতে একটীও কথা নিঃসৃত হইল না, তথাচ চির আকাঙ্ক্ষিত যুবকের সহিত বাক্যালাপ করিতে মেহেরুন্নিশার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে পোড়া লজ্জা আসিয়া সে সাধে বাদ সাধিল। জেলাল পরক্ষণেই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল, সেই সাক্ষাতে মেহেরুন্নিশার হৃদয়-তন্ত্রী যেন আরও সজোরে বাজিয়া উঠিল—দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না হইয়া—আরও বাড়িয়া উঠিল। মোবারককুমারী কতক্ষণে পুনরায় যুবকের সাক্ষাৎ পাইবে, সেই আশায় ব্যাকুলিতা ও সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় যেন জীবন ধরিয়া রহিল। লোক লজ্জা ভয়ে বালিকা অপ্রাভভ।

একবার যখন দেখা হইয়াছে, মেহেরুন্নিশার বাসস্থানের যখন সন্ধান পাইয়াছে, তখন মনে করিলেই জেলাল তাহার সহিত দেখা করিতে পারিবে, গৃহস্থের কন্যা নির্জ্জনে নিভৃতে তাহার সহিত পূর্ব্বে যে কতদিন বাল্য খেলা করিয়াছে—কত কথা কহিয়াছে, তাহাতে পুনরায় সাক্ষাতে সে যে সেইভাবে আলাপ পরিচয় করিবে, এ আশা জেলালের পক্ষে দুরাশা মাত্র! সে বাল্যকালের সরল ভাবের খেলা—সরল ভাবের কথাবার্ত্তা—আর এখন যৌবনের অদমনীয় হৃদয়ের আবেগ উভয়ে বিস্তর প্রভেদ। তবে যুবক স্থির জানিত যে, বালিকা তাহাকে কখনই ভুলিবে না; বাস্তবিকই এবার সাক্ষাতেও মেহেরুন্নিশা তাহাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিল—মুখের সলজ্জ আরক্তিম ভাবেই তাহা

বেশ বুঝা গেল। এতদিন পরে একবারমাত্র দর্শন করিয়া কিন্তু জেলালের মন উঠিল না, দর্শনে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল, মেহেরুন্নিশার সহিত কথোপকথনে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিবার জন্য যুবক ব্যাগ্র হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য মেহের ও জেলাল বাল্যখেলার সাথি হইলেও, কেহ কাহারও অভিভাবক বা অভিভাবিকার নিকট পরিচিত নহে, সুতরাং অপরিচিত ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তদীয় কন্যার সহিত বাক্যালাপ সঙ্গত নহে জানিয়া, জেলাল কথঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ হইল। এতদূর আয়াস ও পরিশ্রমে তাহাকে যে নিষ্ফল হইতে হইবে, পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার এ কথা মনে হয় নাই। মেহেরুন্নিশাও জেলালকে দেখিবার জন্য এবং তাহার সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল; সেই জন্যই অভাগিনী চিত্তশান্ত হারাইয়াছিল, কিন্তু জননীর নিকট একথা ফুটিয়া বলিবার নহে; এত কথা বলে, কিন্তু কি জানি কেন একথা বলিতে গেলে কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরে, কাজেই মেহেরকে মনের কষ্ট মনেই চাপিতে হইয়াছিল।

বহুদিন হইতে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত, সাক্ষাৎ আশায় জেলাল পরবর্ত্তী কয়েক দিবস অকৃতকার্য্য হইলেও, পুনর্ব্বার দর্শনে বালিকার সহিত কথোপকথনে হৃদয় তৃপ্তি অনুভব করিবে, আশা করিল! কয়েকদিন পরে আবার একদিন বৈকালে সেই ছাদে জেলাল প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইল, মেহেরুন্নিশা তাহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টিতে জেলালও উৎসুক নয়নে চাহিয়া অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেহেরুন্নিশা অবিলম্বে ছাদ হইতে অবতীর্ণ

হইয়া সদর দরজা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। অবিলম্বে জেলাল মেহেরুন্নিশার সঙ্গে তদীয় বাটীতে প্রবেশ করিল, ও সাদরে জিজ্ঞাসা করিল :—

"মেহের, চিনিতে পারিয়াছ কি ?"

"মেহের সলজ্জভাবে উত্তর দিল, "পারিয়াছি"।

দেখা হইবার পূর্ব্বে কত কথা বলিবে মেহের ভাবিয়াছিল, কিন্তু সময়ে মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেও তাহার যেন কেমন বাধ বাধ মনে হইতে লাগিল!

"তোমার আর কে আছেন ?"

"আমার মা ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই—তিনি অন্তঃপুরে রহিয়াছেন—তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব ?"

"তাঁহার সহিত সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিব।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কিছু মনে করিও না, মেহের! তোমরা দুইজনেই স্ত্রীলোক এই বাটীতে আছ পুরুষ কেহ নাই, তবে—সংসার কিরূপে চলে ?"

"যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাই ব্যয় হইতেছে—তাহাও আর বড় অধিকদিন চলিবে না। তাহার পর মা বলেন,—খোদার মনে যাহা আছে,—হইবে।"

"তবে তো তোমরা বিপন্ন!"

"সে কথা আর একবার করিয়া বলিতে ? আমাদের নিত্য অভাব দাঁড়াইতেছে।"

"আমি সময়ে সময়ে তোমাদের বাটীতে আসিলে কি তোমার মাতা তাহাতে আপত্য করিবেন ?"

"না, তা করিবেন কেন ? অনুগ্রহ করিয়া দেখা দিলে বড়ই

সুখী হইব। আমরা গরিব মানুষ বলিয়া—আমাদের প্রতি কেহই চাহিয়া দেখে না।"

"সে কি কথা? না দেখিবে কেন—সুখ দুঃখ সকলেরই আছে, এক ভাবে চিরদিন কাহারও যায় না। আর যদি কেহ না দেখে—অনাথার সহায় ঈশ্বর আছেন।"

জেলালের সহিত মেহেরুন্নিশার এইরূপ কয়েকটী কথাবার্ত্তা হইল, পরে আসিবার সময় একটী স্বর্ণমুদ্রা বালিকার হস্তে প্রদান করিয়া বিদায় লইল, কিন্তু তাহার মন যেন মেহেরুন্নিশা সমীপে রহিয়া গেল। বালিকা যুবক প্রদত্ত মোহর গ্রহণে অনেক ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু জেলালের অনুরোধ আকিঞ্চনে তৎসমুদয় উপেক্ষিত হইল। বিদায় কালে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিল, সে দৃষ্টিতে পুনর্দর্শন কামনা—কথায় ব্যক্ত না হইলেও—অপ্রকাশ রহিল না।

এইরূপে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। মেহেরের জননী জেলালকে পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। জেলাল মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও করিত। উভয়ে এইরূপে পরস্পরের প্রতি অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেহেরুন্নিশা এখন আর বালিকা নহেন, কৈশোর অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে যৌবনের প্রারম্ভে উপনীতা হইয়াছেন; এ সময়ে তাঁহাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিলে, সমাজে মুখ দেখান ভার হইয়া দাঁড়াইতেছে। সংসারে প্রয়োজন মত সংস্থান

থাকিলে, পুরুষ-মানুষের অভাব হইলেও, পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য সম্বন্ধ-নির্ণয়ে তাদৃশ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; কিন্তু, মোবারক-পত্নী ফতেমা বিবীর অর্থাভাব—তাহাতে পুরুষ পক্ষীয় অভিভাবক কেহই নাই, আবার স্নেহের পুত্তলী মেহেরন্-নিশাকে সৎপাত্রে দান করিতে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। দরিদ্রের সাধ—দৈব অনুকূল না হইলে, পূরণ হয় না!

কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদীয় মাতার আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে। কি উপায়ে মেহের, সৎপাত্রে পড়ে, এই চিন্তাই মোবারক্‌ জায়ার অহোরাত্র, লোক-সমাজে কিরূপে তাঁহার মুখ রক্ষা হয়, কিরূপে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারেন, এই ভাবনায় তাহার শরীর, জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে। এক এক সময়ে তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতে বসেন; কিন্তু, কূল কিনারা কিছুই ঠিক পান না।

এক দিন মাতাকে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া মেহের, জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! তুমি এত ভাবিতেছ কেন?"

তদুত্তরে মোবারক-পত্নী, সজল নয়নে উত্তর করিলেন—"মা! ভাবনা-সাগরে ভাসিবার দিনই আমাদের পড়িয়াছে। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা কাহাকে বলে—কিছুই জানিতাম না। দেলোগমা শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর বর্ত্তমানে, গৃহস্থালীর কিছুই দেখিতে হইত না। তাহার পর, তাঁহার অবিদ্যমানে সংসারের কাজ-কর্ম্মে জড়িত হইয়াছিলাম—সত্য বটে; কিন্তু তথাপি ভাবনা-চিন্তা—বড় কিছু ছিল না বলিলেই হয়। এক মাত্র কর্ত্তার অভাবে সংসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আয়ের জন্য আমাদের কখন ভাবিতে হয় নাই, গৃহস্থালীর প্রতিই দৃষ্টি ছিল। তিনি উপার্জ্জন করিয়া গৃহে আনি

তেন, বাহিরের যাহা কিছু আনা লওয়ার ভার, তাঁহারই ছিল, কোন্ জিনিষের কি খরচ—সে হিসাবপত্র কখন আমাকে করিতে হয় নাই। কিন্তু ভাগ্যদোষে ভগবান্, বিরূপ হইলেন। যাঁহার অবলম্বনে সাধের সংসার, তিনি তো আমাদিগকে অকূলে ফেলিয়া জন্মের মত চলিয়া গেলেন।"

"তাহা তো সবই দেখিতেছি; কিন্তু ভাবিয়া কি উপায় হইবে?"

"ভগবান্ ভিন্ন অন্য উপায় নাই—এক দিকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব, তাহাতে কন্যাদায়—তাহার উপর লোক-বল নাই—এ অবস্থায় মৃত্যুই ভাল—কিন্তু অনাথার অদৃষ্টে কি সে শুভদিন আসিবে? অখণ্ড পরমায়ুঃ লইয়া এ অভাগিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দুঃখের চরম সীমায় আসিয়াছি—না জানি অদৃষ্টে আরও কত লাঞ্ছনা—কত কষ্ট আছে!"

"মা! কাঁদিয়া তো কোন ফল হইবে না।"

"বাছা! রোদনে কোন ফল নাই, তাহা আমি বুঝি—কিন্তু মা! চক্ষের জল যে, নিবারণ করিতে পারি না। কি ছিল—কি হইল—এ কথা মনে হইলেই যে, আপনা হইতে চক্ষে জল আসে! এক সময়ে আমি দশ জনের এক জন ছিলাম। জনসমাজে মান-মর্য্যাদাও বেশ ছিল। এক স্বামীর অভাবেই আমাদের এ দুর্দ্দশা—এখন দরিদ্র হইয়াছি, তাই লোকালয়ে মুখ দেখাইতে লজ্জা হয়, একটা কথা কহিতেও লোকে, ঘৃণা বোধ করে। কোন ভদ্রলোক যদি ভাল মন্দ কোন কথা বলেন, তাহাতে লোকে, দূষ্য ভাবে—এই ভয়ে কাহারও সহিত আলাপ করিতেও ভয় হয়।"

"কেন মা! লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেও কি দোষের কথা? জেলাল্ উদ্দীন্ তো সময়ে সময়ে আমাদের সন্ধান ল'ন,

সাহায্য করেন, আমরা গরিব বলিয়া তিনি কি ঘৃণা করেন? বাস্ত বিকই মা! তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে, আমার মন, বড়ই প্রফুল্ল হয়। ভদ্রলোক—ভদ্রের খাতির যত্ন জানেন।”

“জেলাল্ উদ্দীন্ তো আমাদের পর নহেন, তিনি তোমার দাদা মহাশয়ের মাসীর দৌহিত্র। জেলালের পৈতৃক অবস্থা আমাদেরই মত ছিল, এখন অবশ্য জেলালের খুড়া দশ টাকা উপায় করিতেছেন, সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। খুড়া যখন এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী,—ভ্রাতুষ্পুত্রও সেইরূপ না হইবেন কেন? আমাদেরও এক সময়ে দশ টাকা সংস্থান হইয়াছিল, কর্ত্তার বাটী প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা খরচ হয়। সঞ্চয়ের প্রতি তাঁহার প্রথম হইতে লক্ষ্য থাকিলে, আমাদের এত কষ্ট হইত কি? তিনি পূজ্য ব্যক্তি, তাঁহার স্বর্গবাস হইয়াছে, আমাদিগকে তো পথের ভিখারী করিয়া যান নাই! তবে কিনা—কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতেই ফুরাইয়া যায়! মেয়ে-মানুষ, সুদে খাটাইয়া বা কোন কাজ কর্ম্ম করিয়া যে পুঁজি বাড়াইব, সে ক্ষমতাও আমার নাই, ক্রমে ক্রমে সে টাকা-গুলি শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই আমাদের এরূপ অবস্থা! নতুবা জেলালের ও আমাদের অবস্থা—একই ছিল।”

“মা! পয়সা থাকিলেই কি সুখ?”

“বাছা! এখন যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে ধন থাকিলেই সুখ। ধনশালীই, পূজ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়; যাহার টাকাকড়ি নাই—তাহার সম্মান সম্ভ্রম কোথায়?”

“মা! ঈশ্বর, জীবন দিয়াছেন, তিনিই আহার জুটাইবেন—পৃথি-

বীতে অনাহারে কয় জন মারা পড়ে ? তুমি বাছা ! অমন করিয়া আর ভাবিও না।”

“বাছা ! অন্নবস্ত্রের জন্য আমি বড় ভাবি না, দুঃখে কষ্টে দিনপাত হইবে ; কিন্তু, তোমাকে সুপাত্রে দান করিতে না পারিলে, কিছুতেই যে, আমার চিত্ত তৃপ্তি হইতেছে না। সেই ভাবনাই—আমার প্রধান ভাবনা।”

“মা ! যদি ভাত-কাপড়ের জন্যে ভাবিতে না হয়, বিবাহ-বিষয়েও সেইমত জানিবে। যাহা হইবার, তাহাই হইবে।”

এইরূপ কথোপকথনে মার ও মেয়ের বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু কথার মীমাংসা কিছুই হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

জেলালকে আয়ত্তাধীন করিতে আলা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রকৃতি ভিন্ন ভাবাপন্ন, সেই জন্য উভয়ে মিল হইত না। আলাউদ্দীনের পৈতৃক অবস্থা ভাল ছিল না, সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূর হয়। ভাগ্যলক্ষ্মী, তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না, তাই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সঙ্গতিপন্ন ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন ; কিন্তু, বিষয়-লালসা পরিতৃপ্ত হইবার নয়, উত্তরোত্তর বিজয়লাভে আলার ধনাকাঙ্ক্ষা, সাতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই আলাউদ্দীন্ খাঁ, বাগান বাড়ী পুষ্করিণী প্রভৃতি, ধনাঢ্যের বাহা

কিছু প্রয়োজন, তৎসমস্তই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যথাসময়ে বিজয়পুর-লুণ্ঠনে মণি-মাণিক্যে তাঁহার গৃহ, বিভূষিত হইয়াছিল; এখন দুর্লভ রত্নরাজি তাঁহার উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কল্পনাতেও, যে সকল হীরক জহরৎ দেখেন নাই, এক্ষণে সেই মহামূল্য-প্রস্তররাজির তিনি মালিক! ক্রমিক জয়লাভে তাঁহার ধনবৃদ্ধির স্পৃহা, এতই বলবতী হইয়াছিল যে, সুযোগ বুঝিলেই, তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

পিতৃব্যের মত পরের যথাসর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনে জেলাল্ উদ্দীনের আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি চিত্রবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। এ কারণ অবসর-মতে নিজ-গৃহে বসিয়া মনঃসংযোগ সহ চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে রত থাকিতেন। তিনি নির্ব্বিরোধ, কাহারও উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা পীড়ন করিতে জানিতেন না। দুই বেলা আহারে ও সামান্য বেশ ভূষায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, তাঁহার দিন যাপিত হয়।

আলা উদ্দীন্, এখন প্রৌঢ় অবস্থায় নীত। যৌবনের প্রারম্ভেই—তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু, সাধের সংসার পাতিয়া সুখভোগে তাঁহার অধিক দিন যাপিত হয় নাই. প্রীতি-ভাজন পুত্র-পুত্রী না হওয়ায়, তিনি পরিবারের উপর বিশেষ আসক্ত ছিলেন না, যে বন্ধনে সংসার-ধর্ম্ম-অবলম্বন—কালবশে তাঁহার সেই সহ-ধর্ম্মিণীই, অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া, তিনি সংসারী হইতে পারিতেন; কিন্তু, সে ইচ্ছা তাঁহার মূলেই ছিল না—বিবাহে তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, তিনি এক সময়ে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে উদ্যত; কিন্তু, পর-ক্ষণে তাঁহার মনের উদ্বেগ মনেই

মিলাইয়া যায়! অথচ তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানে এক-মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র তদীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে,একারণ জেলালউদ্দীনকে মনের মত দীক্ষিত করিতে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃপুত্রকে যে ভাবে গঠিত করিতে চেষ্টা করেন, প্রকৃতিভেদে তাঁহার সে মনোরথ পূর্ণ হইয়া উঠে না। জেলালের মতি গতি স্বতন্ত্র, পিতৃব্য যে পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, জেলাল সে পথে না গিয়া, অন্য পথে চলিয়া যায়! পদে পদে উভয়ের মতের অনৈক্য হওয়ায়, আলাউদ্দীন কথন কথন ভ্রাতৃকুমারের ব্যবহারে মম্মাহত হইয়া পড়েন, এমন কি দুই চারি বার বিরক্ত হইয়া, ভ্রাতৃপুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত রহিত করেন, কিন্তু এরূপ করিয়াও আলা জেলালকে আপনার মতাবলম্বী করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃকুমার মনের মত হইল না বলিয়া, পিতৃব্যের আক্ষেপ থাকিয়া গেল!

একদিন জেলাল নিভৃতে নিজকক্ষে কোন রমণীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে ছিলেন, আপনার ভাবে ভোর হইয়া তিনি চিত্রময়-প্রতিরূপের যেখানে যাহা অভাব, সে স্থানে যে রঙ ফলা-ইলে, সে খানি সুন্দর দেখায়, এই গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন! চিত্রখানি আদর্শ স্বরূপ প্রস্তুত করিতে জেলালের নিতান্ত স্পৃহা, তাই একাগ্র-চিত্তে চিত্রের চিত্রণে তিনি ব্যাপৃত, এমন সময়ে আলাউদ্দীন তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া, তুলিকা গ্রহণে সেই সম্পূর্ণ প্রায় সুরঞ্জিত প্রতিমূর্ত্তিখানি বিকৃত করিলেন।

খুল্ল-তাতের ঈদৃশ অবৈধ ব্যবহারে শিল্পবিদ্যাবিশারদের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল, বহুকষ্টে বিশেষ মনোযোগে ও সতর্কতায়

তিনি সেই চিত্রখানির অঙ্কন ও রঞ্জন, প্রায় শেষ করিয়া আনিয়া-ছিলেন, দৈবাৎ আলাউদ্দীন খাঁর এরূপ অন্যায্য আচরণে, তাঁহার অন্তরে দারুণ বেদনা লাগিল! কিন্তু, গুরুজনের অযথা আচরণ কঠোর হইলেও, কোন কথা মুখ হইতে বাহির করিতে, তাঁহার ভরসায় কুলাইল না; তিনি চিত্রখানির প্রতি ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে কোন কথার দ্বিরুক্তি না হইলেও, আলা সদর্পে বলিলেন, "আমি আল্লার নিকট কামনা করি যে, তোমার এই আঁজি পুঁজি বিদ্যা চিরদিনের মত ঘুচিয়া যায়। তোমায় ছবি আঁকিতে দেখিলে, আমার প্রাণ তোমার উপর এককালে চটিয়া উঠে। ছবি আঁকিয়া কি সংসারে তুমি বড় মানুষ হইতে পারিবে? ইহাতে জন্ম জন্মান্তরেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি যোদ্ধা হও, তোমাকে সৈনিক পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে—আমি সুখী হই। বীরত্বের লীলাভূমি যুদ্ধক্ষেত্র; সমরক্ষেত্রে বিজয় লাভে অক্ষয় কীর্ত্তি! তোমাকে বার বার অনুরোধ করিলেও, আমার সে আকাঙ্ক্ষায় তুমি আস্থা দেখাও না—আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা করিতেছ না—ইহা কি সঙ্গত হইতেছে? আমি তোমার পিতৃব্য, অভিভাবক ও লালন পালন কর্ত্তা; মনে ভাবিয়া দেখ—আমার অন্নেই তুমি পালিত হইতেছ; অথচ আমার কথা না রাখিলে বা আমার অভিপ্রায়া-নুরূপ কার্য্য না করিলে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইব। তুমি আমার অবাধ্য হইলে—স্থির জানিও—আমার আশ্রয়ে আর তোমার স্থান হইবে না। আর এক কথা—আমি ভাবিয়া-ছিলাম—আমার অবিদ্যমানে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি

তোমারই হইবে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ আগ্রহ আকিঞ্চনেও যখন তুমি আমার কথা না শুনিতেছ—আমার আদেশের উপেক্ষা করিতেছ—আমি তোমায় এক কপর্দ্দকও দিব না। তোমার মুখ চাহিয়াই, আমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ পর্য্যন্ত করি নাই, কিন্তু যখন তুমি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইতেছ—নিশ্চয় জানিও, আমি আবার বিবাহ করিব।"

পিতৃব্যের কথায় জেলাল সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "খুড়া মহাশয়! আমি এত পরিশ্রম করিয়া চিত্রখানি প্রস্তুত করিতেছিলাম, আপনি ক্রোধের আবেগে আমার এমন চিত্রখানি নষ্ট করিলেন—আমার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইল! আপনি আমার গুরু, পূজ্যপাদ—আপনাকে কোন কথা বলিবার অধিকার আমার নাই। যোদ্ধা হইবার সাধ থাকিলে, অবশ্যই একদিনে সেই ব্রতে ব্রতী হইতে পারিতাম, কিন্তু সে সাধ আমার কখন হয় না! আমি চিত্রকর, এই চিত্রশিল্প লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিব—সুতরাং এবিষয়ে আমায় ক্ষমা করিবেন। তবে, আপনি যে বিবাহ করিতে অভিলাষী, এ সংবাদে আমি সম্যক্ সন্তুষ্ট! আপনার ঐশ্বর্য্যের অভাব কি?—যথেষ্ট ধন সম্পত্তি রহিয়াছে, বিবাহ না করিবেন কেন? আপনি যাহার পাণিগ্রহণে মনন করিয়াছেন—সেই ভাগ্যবতী কে?"

তদুত্তরে আলাউদ্দীন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে কন্যার পরিচয় পাইলে, তোমার এরূপ হাস্যবদন আর থাকিবে না, মর্ম্ম যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িবে। আর এক কথা, আমি কিরূপ কন্যাকে প্রিয়তমার পদে বরণ করিব—সে সংবাদ জানিতে তোমার অধিকার কি?"

চিত্রখানি নষ্ট করিবার পূর্ব্বে অবশ্য আলা সে খানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার মনোনীতা পাত্রীর সন্ধান গ্রহণে ভ্রাতষ্পুত্রের এত আগ্রহ কেন—তাহা বুঝিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহাকে পাত্রীর নাম ধাম কিছুই বলিলেন না। জেলাল কিন্তু আলাউদ্দীনের বাক্যালাপে ক্রমে যাহা জানিতে পারিলেন—তাহাতেই তাঁহাকে অতীব বিচলিত করিয়াছিল; কিন্তু, যতক্ষণ না তিনি সবিশেষ অবগত হইতেছেন, কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইবে না। পিতৃব্যকে তিনি কোন কুকথা বলেন নাই, সসম্মানেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; অথচ আলাউদ্দীন প্রতি কথায় তাঁহার সহিত কঠোর ব্যবহার করায়, তিনি মনে মনে বড়ই ব্যথিত হইলেন ও কারণ অন্বেষণার্থ মনে মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এ রহস্যের ভেদ না হইলে, তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না! পিতৃব্য তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, প্রকৃত ব্যাপারটী জানিবার জন্য তিনি সাতিশয় উৎসুক হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তথাচ আলাউদ্দীন্‌কে আপনার বলিয়া আদর যত্ন করিতে, তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে, একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র জেলাল্—ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না। পিতৃব্য, তাঁহাকে লইয়াই সংসারী। সংসারে অন্যান্য পরিজন বর্গ না থাকায়, আলার সহিত জেলালের মনোমালিন্য হইলেও সে ভাব অল্প ক্ষণের জন্য স্থায়ী হইবার কথা, যেহেতু কার্য্য-সূত্রে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুনরায় মিলিত হইতে হইত। আলা

যে মেহেরল্‌নিশার পাণিগ্রহণে অভিপ্রায় করিয়াছেন, পরে কথা-প্রসঙ্গে জেলাল পিতৃব্য-প্রমুখাৎ এতৎ সমাচার জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

হঠাৎ বজ্রধ্বনি-শ্রবণে যেরূপ চমকিত হইতে হয়, পিতৃব্যের কথায় ভ্রাতুষ্পুত্র সেইরূপ শিহরিয়াছিলেন, কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার যেন চৈতন্য লোপ পাইয়াছিল। তিনি কয়েক দিবস সাধ্যানুরূপ পরিশ্রম করিয়া যে চিত্রখানি আঁকিতে ছিলেন, পাঠক জানিতেছেন, সেখানি মেহেরল্‌নিশারই প্রতিকৃতি। বিরলে বসিয়া জেলাল সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিতেন, কল্পনার সাহায্যে তাঁহারই প্রতিকৃতি মনোমত করিয়া আঁকিতে'ছিলেন। খুড়া মহাশয় তাঁহার সেই ধ্যানে গড়া ছবিখানিতো নষ্ট করিলেনই, অধিকন্তু তাঁহার উপাস্য মূর্ত্তিমতী দেবীকে আত্মসাৎ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই ঘটনায় জেলালের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি মনোভাব-গোপনে সাধ্যমতে চেষ্টিত হইয়াও সহিষ্ণুতাবলম্বনে অক্ষম হইলেন। একদিন পিতৃব্যকে বলিলেন, "কাকা! আপনি আমার চিত্রখানি নষ্ট করিয়া যত না কষ্ট দিয়াছেন, মেহেরল্‌নিশাকে বিবাহ করিবেন—মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া, তদধিক প্রাণে আঘাত করিয়াছেন। আপনি আমার আরাধ্য ও পিতৃস্থানীয় গুরুজন, কোন প্রকারে আমি আপনার মনঃক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু মেহের জীবন-প্রতিমা—আমার প্রাণের প্রাণ—আমি তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী. যে রমণী আমার সহিত প্রণয়-সূত্রে মিলিত, কিরূপে আপান তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন? একথা কিছুতেই আমার মনে ঠাঁই পায় না। এরূপ গর্হিত কথার উত্থাপন করিয়া আপনি কেন আমার প্রাণে ব্যথা দিতেছেন? আমি আপনার আদেশ পালন করি নাই—

সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত হইতে স্বীকৃত নহি—ইহাতে, আমার ব্যবহার অন্যায় হইলেও, এরূপ অপ্রিয় কথা আপনার মত সদ্বিবেচক ব্যক্তির যোগ্য হইতে পারে না! সম্ভবতঃ আপনি আমাকে শাসনচ্ছলে এরূপ বলিতেছেন! স্নেহ নীচগামী—সন্তান সহস্র দোষে দোষী হইলেও, পিতা মাতার চক্ষে মার্জ্জনীয়—আমাকে মনস্তাপিত দেখিলে, আপনিই প্রাণে ব্যথা পাইবেন। আমি আপনার সন্তানের তুল্য, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

জেলালের কথায় আলা চিরাভ্যস্ত রূঢ়স্বরে বলিলেন, "আমার ভালমন্দ—আমারই হাতে; কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়—সে বিচার আমি তো'র মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি না—তুই আমার আশ্রিত—অন্নদাস, তো'র এতদূর স্পর্দ্ধা যে, তুই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিস্—আমার কথার উপর কথা কহিস্? সামান্য ছবি আঁকিয়া যাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে—সে কি মানুষ? তুই একটা অকর্ম্মণ্য জীব—কি বলিয়া সেই সুন্দরীর পাণি গ্রহণে আশা করিয়াছিস্। জগৎ অর্থের দাস—মেহেরুল্‌নিশা আমার এই অতুল বৈভব উপেক্ষা করিয়া কোন প্রলোভনে তো'কে পতিত্বে বরণ করিবে? তো'র এ সঙ্কল্প—বাতুলতার পরিচয় মাত্র—বামনের চন্দ্রস্পর্শের কামনার মত—তো'র এ আশা দুরাশা মাত্র। অন্যপক্ষে মেহেরুল্‌নিশা বালিকা, সে ভাল মন্দ কিছুইঅবগত নয়। আমি তাহার মাতা ফতেমা বিবীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিবাহে মনন করিয়াছি, তুই তাহাকে কোন্. প্রলোভনে মোহিত করিতে পারিবি? ধন-কুবেরের আকিঞ্চন অগ্রাহ্য করিয়া, সে কি তো'র ন্যায় হতভাগ্য পথের ভিখারীকে কন্যা দান করিবে।"

জেলাল। পিতৃব্যদেব! আমায় ক্ষমা করিবেন—মেহেরল্‌-নিশা সতী, সে কখনই আমার প্রেমভিক্ষার অনাদর করিবে না! বালিকা হইলেও সে সর্ব্বগুণসম্পন্না ও সরলহৃদয়া! আমার নিকটে সে, যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এদিকের চন্দ্র ওদিকে উদয় হইলেও, তাহার কথার অন্যথা হইবে না। সে, কখনই আপনার অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।

আলা। ভাল. দেখা যাউক—কাহার কথা রক্ষা হয়! মূর্খ, জানিস্—অর্থ বলে বলীয়ানকে কখনই পশ্চাৎপদ হইতে হয় না।

জেলাল। অর্থলোলুপা বৃদ্ধা ফতেমা বিবীর ষড়যন্ত্রেই বোধ হয় এই বিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে; কিন্তু স্থির জানিবেন—আমার কথা অপ্রিয় হইলেও—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, মেহেরল্‌নিশা কদাচ আপনাকে স্বামি-পদে বরণ করিবে না, সে আমার—আমি তাহার, দেল্ মোহরের চুক্তি না হইলেও, স্থির জানিবেন—উভয়ে আন্তরিক প্রণয়সূত্রে মিলিত হইয়াছি।”

ভ্রাতুষ্পুত্রের এই সদম্ভবাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ আলা এক-কালে অগ্নিশর্ম্মা, তিনি সদর্পে বলিলেন, “পিশাচ! নরকের কীট হইয়া ত্রিদিবের সুধা সম্ভোগে তো'র অভিলাষ? কোন্ সাহসিকতায় আমার সম্মুখে এরূপ অন্যায় অসঙ্গত কথা তোর মুখ হইতে বহির্গত হইল? ভাল—এখনই তো'র ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি—দেখি—কাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়!”

বৃদ্ধ, সক্রোধে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াই, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা জেলাল্‌কে সজোরে আঘাত করিলেন। বিনাপরাধে পিতৃব্য কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া চিরধীরস্বভাব জেলাল্‌উদ্দীনও কুপিত

হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আলাউদ্দীনকে প্রতিপালক ও পূজনীয় পিতৃব্য জ্ঞানে সে আঘাতে প্রতিরোধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; নির্ব্বিরোধে তিনি সে পীড়ন, সে অত্যাচার, অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। আলা জেলালকে নীরব দেখিয়া, অপেক্ষাকৃত সজোরে তাঁহাকে পুনরায় যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন। জেলাল আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, পিতৃব্যের হস্ত হইতে সেই যষ্টি খণ্ড কাড়িয়া লইলেন এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ক্রোধে ও অপমানে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ে দ্বন্দ্বে উদ্যোগী, আলার পুনঃ পুনঃ প্রহারে জেলাল উত্তেজিত, এমত সময়ে শুভ্রপরিচ্ছদধারী এক যুবক ভৃত্য ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক আর কেহ নহে, আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত মুলুকচাঁদ।

বিজয়পুর-রাজকুমার মুলুকচাঁদ আজ মুসলমানের দাস। যুবক এক্ষণে প্রভুর মনোরঞ্জনে সর্ব্বদা উদ্যোগী, তাহার লালন পালনের সকল ভার; আলাউদ্দীন গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কর্ত্তার সন্তোষ সাধনে ভৃত্য কোন প্রকার ত্রুটি করে না। ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আলাউদ্দীনকে কলহে নিযুক্ত দেখিয়া, মুলুক জানু পাতিয়া জোড়করে বিনয় নম্রস্বরে বলিল, "হুজুর! জাহাঁপনা! প্রকৃতিস্থ হউন—দাসের নিবেদন অবধান করুন। আপনি রাজা—সহস্র সহস্র লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সুতরাং আপনি সামান্য কারণে বিচলিত হইলে, অপরে কি বলিবে? আপনি সদ্বিবেচক ও সুবিজ্ঞ, আপনার মত মহাত্মা ক্রোধে অধীর

হইলে—সকল দিকে অনিষ্ট ঘটিবে। পিতা পুত্রে বাদানুবাদ ক্ষণ-স্থায়ী, এখনই ছোট হুজুর আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আপনার শরণাপন্ন হইবেন; কথা প্রসঙ্গে মতান্তর প্রযুক্ত এরূপ করিলে, সংসারে অশান্তির বৃদ্ধি হইবে। রণস্থলে এককালে যে হস্তে শত শত বীরের সংহার হইয়াছে, সেই হস্তে পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র একটী যুবককে পীড়ন করিলে, আপনারই কলঙ্ক ঘোষিত হইবে।"

মুলুকের কথায় আলা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর তিনি যেরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন, সহসা সে ক্রোধের শান্তি হইল না, জেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি সদম্ভে উত্তর করিলেন, "মুলুক! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ—উহাকে প্রহার করিলে—আমারই কলঙ্ক; দেখ—কুকুরকে অধিক আদর করিলে, সে মাথায় উঠিতে চায়। আমার তাহাই ঘটিয়াছে। ছোট মুখে বড় কথা প্রাণে বড়ই অসহ্য! পাজি আমার খাইয়া, আমার পরিয়া, আমারই গায়ে হাত তুলিতে চায়? যা'ক, আর কিছু বলিতে চাহি না—আমি উহার মুখ দেখিতে চাহি না। আজ হইতে আমার সহিত উহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, আমি উহার কোন সংস্রবে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না।

পিতৃব্যের এরূপ ভৎর্সনা বাক্যে জেলালউদ্দীনের বদন মণ্ডল অধিকতর আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি ইতিপূর্ব্বেই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন. এক্ষণে আলার ঈদৃশ ইতরোচিত কথায় তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং পিতৃব্য বলিয়া সম্মান করিতেও পারিলেন না, প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "যে যেমন, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিতে হয়—হাঁত তোলা কি? তুমি যতক্ষণ না মেহেরুন্নিশার পাণিগ্রহণের আশা ত্যাগ করি-

ভেছ, তাহাকে জন্মের মত না ভুলিতেছ—স্থির জানিও, তোমার নিস্তার নাই। আমার প্রাণ থাকিতে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দিব না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি—আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, সে আমার প্রাণের প্রিয়তম, আমি জীবিত থাকিতে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে? সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে তোমার কবর হওয়া ইচ্ছা নহে বলিয়া, তুমি কুসুম কাননে যে মর্ম্মর প্রস্তর খচিত সমাধি স্তম্ভ স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছ, নিশ্চয় জানিও—অবিলম্বে তোমায় সেই স্থানে পুতিয়া রাখিব।"

খুড়া ভাইপোর বচশা শুনিয়া মুলুকচাঁদ উভয়কেই সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইল। ইতিপূর্ব্বে ভৃত্য যথাসাধ্য প্রভুকে প্রবোধিত করিয়াছে, এক্ষণে জেলালের যাহাতে ক্রোধ সম্বরণ হয়, যুবক তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিল। মুলুক আপন স্বভাবসিদ্ধ সরলভাবে জেলালের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া, মৃদুপদবিক্ষেপে তাঁহাকে গৃহের দ্বারদেশে লইয়া আসিল। তাঁহার ক্রোধের তখনও উপশম হয় নাই, পিতৃব্যকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি মুলুককে অনর্থক কতক গুলি তিরস্কার করিলেন। তদুত্তরে মুলুক বলিল, "সাহাজাদা! ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া—এখন যে সকল কথার উচ্চারণ করিতেছেন, সময়ে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে—এই সকল কথার জন্য আপনাকে দুঃখিত ও লজ্জিত হইতে হইবে। আর এক কথা, আপনি প্রভুকে হত্যা করিবেন বলিয়া—আস্ফালন করিতেছেন—ভয় দেখাইতেছেন, হয় তো কুগ্রহে সত্য সত্যই আপনি উহাঁর প্রাণ হন্তারক হইতে পারেন, ভবিষ্যতের কথা কে কি বলিতে পারে?"

এইরূপ আরও অনেক প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া মুলুক-চাঁদ জেলালের ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিল; ক্রমে সেই হিন্দু ভৃত্যের সুমধুর সারগর্ত্ত উপদেশবাণী জেলালের উগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। ভ্রাতুষ্পুত্র খুড়া মহাশয়ের সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, মুলুকচাঁদ তৎসহ যাইয়া জেলালকে তাঁহার কক্ষে রাখিয়া আসিল এবং কথা প্রসঙ্গে বিনয়নম্র স্বরে বলিল, "হুজুর! আপনি না হয়—এইস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করুন, বাক্‌বিতণ্ডায় অনিষ্টের সম্ভাবনা। আপনার অপেক্ষা প্রভুর প্রকৃতি আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি এতদিন একত্র সহবাসে আনুসঙ্গিক লোকজনকে তিনি কিরূপ বিরক্ত করেন ও অনর্থক সকলকে কিরূপ ব্যথিত করেন—আমি তাহা সবিশেষ জানি। রূপবতী রমণীর পাণিপীড়ন সম্ভবতঃ তাঁহার অভিপ্রেত নহে, আপনার মনক্ষুণ্ণ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। যাহা হউক, উপস্থিত আপনি এই গৃহেই থাকুন, বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আপনার রাত্রির আহার আমি এখানে পাঠাইয়া দিব। কর্ত্তার সহিত এখন সাক্ষাৎ হইলে, পুনর্ব্বার বাদ বিসম্বাদ ঘটিতে পারে। ধীরভাবে রাত্রিটা যাপন করুন—দেখিবেন—কাল প্রভাতে এই প্রবল ঝটিকার বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকিবে না। ঝগড়া বিবাদে সংসার-পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া যায়, ইহাতে বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা। জগতে শান্তির পথই সুগম ও সুপ্রশস্ত।"

ক্রোধের সঞ্চারে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি লোপ পায়, ভাল মন্দ বিচার শক্তি থাকে না। পিতৃব্য সহ বিবাদ কালে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, জেলাল বৃদ্ধের মনক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, শুরু

জনের প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন, প্রকৃতিস্থ হইতে না হইতে সেই সকল কথা জেলালের স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল, সে চিন্তায় তাঁহার সাতিশয় লজ্জা বোধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-গ্লানিও হইতে লাগিল।

এদিকে প্রবীণ আলাউদ্দীন প্রকৃতিস্থ হইয়া গত ঘটনাগুলি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সরল যুবক জেলালকে অকারণ কটূক্তি প্রয়োগে ব্যথিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই, তাঁহার বহু আয়াসের, বহু যত্নের অঙ্কিত প্রণয়িণীর প্রতিকৃতিখানি নষ্ট করিয়াছেন, এই সকল চিন্তা যতই বৃদ্ধের মনে আসিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাঁহার চিত্ত ততই ব্যথিত হইতে লাগিল। অবশেষে জেলাল সম্বন্ধে আর কোন কথার আন্দোলন না করিয়া, বৃদ্ধ সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন।

মুলুকচাঁদের পরামর্শ ও মধ্যাস্থে উভয় পক্ষের শান্তিলাভ হইল। ভ্রাতুষ্পুত্র ও পিতৃব্য—উভয়েই আপন আপন হটকারিতার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, উভয়েরই দারুণ মনস্তাপে সে রাত্রি যাপিত হইল। সে রাত্রিতে পরস্পর আর দেখা সাক্ষাৎ হইল না।

সুচতুর মুলুক সুবিধামত উভয়েরই সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিল, উভয়কেই যথাসাধ্য সান্ত্বনা প্রদানও করিয়াছিল। বিধর্মী ভৃত্য হইতে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মনোমালিন্য যে সমধিক বৰ্দ্ধিত হইল না, কিয়ৎক্ষণ পরেই যে, অশান্তির উপশম হইল—ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু রাজকুমার মুলুকচাঁদ পিতৃশত্রু মুসলমান আলাউদ্দীনের নিকট দাস ভাবে রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখের বা কষ্টের ভাব যে, লক্ষিত হয় না, ইহার কারণ কি? না জানি কি মহৎ অভিসন্ধি হৃদে ধরিয়া রাজকুমার আলাউদ্দীনের পুরিতে বাস করিতেছেন। আর্য্য নৃপতিনন্দন অনার্য্যের দাস, আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা থাকিলেও, মুলুকচাঁদ আলাউদ্দীনের মনোরঞ্জনে অনুক্ষণ উদ্যোগী! শত শত দাসদাসী এক সময়ে যে রাজপুত্রের চিত্তবিনোদনে ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, অদৃষ্টদোষে, ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতায় এক্ষণে তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। বাল্যের-বিলাস-ভোগ-স্মৃতি—সময়ে সময়ে মুলুকের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে, নিভৃতে নয়নাসারসিক্ত হইয়া অভাগা সে কষ্টের উপশম করেন।

পশুপ্রকৃতি নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন রাজকুমার মুলুকের কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন, তাঁহাকে জন্মের মত ঐশ্বর্য্য সুখভোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। পাপমতির দারুণ অত্যাচারেই রাজপুত্র আত্মীয় স্বজন, পাত্র মিত্র বিষয় বিভব সকল সুখে চিরবঞ্চিত হইয়াছেন। পিতৃহন্তার অত্যাচারের যথাযথ প্রতিশোধ কামনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াই যে, মুলুকচাঁদ প্রভুর একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, ও সেই জন্যই বিজাতীয় আলাউদ্দীনের স্নেহ ও প্রীতিলাভ করিয়াছেন, হীনচেতা বিধর্ম্মীর নয়নপুত্তলী হইয়াছেন, এ রহস্য কে বুঝিতে পারে?

মুলুক এক্ষণে আলাউদ্দীনের বিশ্বস্ত, প্রিয়পাত্র। প্রভু

তাঁহাকে যখন যাহা আদেশ করেন, তিনি সাগ্রহে তাহা পালন করিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে রাজকুমার প্রভুর এরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন যে, আলাউদ্দীনের গোপনীয় কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট অপ্রকাশ থাকে না। আহার বিহার আমোদ প্রমোদ সকল বিষয়ে সকল স্থানে মুলুক আলাউদ্দীনের অনুগামী! আনুগত্য স্বীকারে রাজপুত্র আলার এরূপ স্নেহ-ভাজন ও প্রিয় হইয়াছেন যে, জেলাল যে সকল গোপনীয় সংবাদ কিছুমাত্র জানিতে পারে না, মুলুক পূর্ব্বাহ্ণেই তৎসমুদয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন।

বয়োবৃদ্ধি সহ জাতীয় ধর্ম্মের অনুশীলনে মুলুকের কোন ত্রুটি হয় নাই, আলাউদ্দীনের সংসারে সৈনিক পুরুষের অভাব ছিল না, তাহারা প্রতিদিনই যথাসময়ে ব্যায়াম চর্চ্চা করিত, মুলুক শিষ্যভাবে তাহাদের সহিত পরিচিত ও মিলিত হওয়া, কতিপয় দিনের মধ্যেই অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। অস্পর্শীয়ের অন্নভোজন হিন্দুর নিষিদ্ধ, সেইজন্য তিনি প্রভুর নিকট স্বপাক ভোজনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করিয়াছেন, রাজপুত্র তাঁহারই পীড়নে পথের ভিখারী, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তিনি কাড়িয়া লইয়াছেন, আত্মীয় স্বজন নিধন করিয়াছেন—এই সকল কথা এখন আলার স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকায়, ভৃত্যের কোন আবেদনই প্রভুর নিকট উপেক্ষিত হইত না; সুতরাং মুলুকচাঁদের স্বপাক ভোজের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বিধর্ম্মীর আশ্রয়ে দিনপাত করিয়াও মুলুকচাঁদের শিক্ষা দীক্ষা ও স্বধর্ম্ম পালনাদির পক্ষে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আলাউদ্দীন বাল্যাবস্থায় মুলুকচাঁদকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছেন, বহুদিন সহবাসে তিনি মুলুকের স্বভাব চরিত্র সম্যক বুঝিয়াছেন। তাহাতে মুলুক এক্ষণে আর বালক নহেন, যৌবন সীমায় উপনীত হইয়াছেন,আলার প্রতি তাঁহার গুরুভক্তির লক্ষণ সকলও প্রকাশ পাইয়াছে, এসময়ে মুলুক তাঁহার আর কি অনিষ্ট করিতে পারেন? অধিকন্তু, মুলুক ইচ্ছা করিলেই যে, স্বদেশে যাইতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। বাল্যকালে তিনি নীত হইয়াছেন, কোন পথ দিয়া কোথায় আসিয়াছেন, সে সন্ধান রাজপুত্র কিছুমাত্র জানেন না, তাহাতে তাঁহার উপর সর্ব্বদাই আলাউদ্দীনের দৃষ্টি রহিয়াছে, সুতরাং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ভাবেই যাপন করিতে হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসে অবিশ্বাসী আলাউদ্দীন মুলুককে আপনার ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। জেলালউদ্দিনের আহার বিহারে তাঁহার যেরূপ দৃষ্টি, মুলুকের প্রতিও তিনি সেইরূপ দেখিয়া থাকেন।

এদিকে মেহেরল্‌নিশার বিবাহের জন্য ফতেমা বিবী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। স্থানে স্থানে পাত্রের সন্ধান হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একে অর্থাভাব—তাহাতে সংসারে পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই! পাত্রী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী, এজন্য বরপক্ষ দেখিতে আসিয়া সকলেই মনোনীত করেন, কিন্তু কন্যাপক্ষের দারিদ্রের কথা শুনিলেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, কোথাও ধার্য্য হয় না। কন্যাকে বয়োপ্রাপ্তা দেখিয়া মাতার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে, কিন্তু যাহা ভবিতব্য আছে, তাহা কিরূপে লঙ্ঘন হইবে?

আলাউদ্দীনের মত জেলালউদ্দীন সংসারী নহেন, এতাবৎকাল

পিতৃব্য অন্নে তাঁহার দেহের পুষ্টিসাধিত হইয়াছে, গ্রাসাচ্ছাদন সকল বিষয়েই ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের মুখাপেক্ষী। তথাচ অবসর মতে জেলালউদ্দীন মেহেরল্‌নিশার বাটীতে যাতায়াত করেন, তাহাদের দুঃখে দুঃখ দেখান এবং যথাসাধ্য আর্থিক ও কায়িক সাহায্যে মাতা ও পুত্রীর উপকার করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে তাঁহার খরচপত্রের জন্য পিতৃব্য যে যৎসামান্য অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইতেই অধিকাংশ সঞ্চয় করিয়া জেলাল মেহেরকে মধ্যে মধ্যে দিয়া আসেন। উপার্জ্জন বা অন্য উপায়ে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা এখনও যুবকের হয় নাই!

জেলালের ব্যবহারে ও সৌজন্যতায় মাতা পুত্রী উভয়েই সন্তুষ্টা, কিন্তু যতক্ষণ না তিনি উপায়ক্ষম হইতেছেন, তাঁহাদের সকল অভাব দূরীকরণে তাঁহার সাধ্য কি? সর্ব্বদা যাতায়াতে জেলাল-উদ্দীনের সহিত মেহেরল্‌নিশার প্রণয় দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে, যুবকের সহ মোবারক-কুমারীর সাক্ষাৎ হইলেই, উভয়েরই নানা-প্রকার কথাবার্ত্তায় বহুক্ষণ যাপিত হইয়া থাকে। একে অন্যের নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সুখদুঃখের কত কথা কহেন, গোপনীয় বিষয়ও উভয়ে উভয়ের নিকট প্রকাশ করেন। এইরূপ ঘন ঘন মিলনে একে অন্যের প্রতি আসক্ত, কিন্তু মনের আশা মনেই মিলাইয়া যাইতেছে। জেলাল মেহেরজননীর নিকট তদীয় কন্যার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ, জেলাল এখনও পরমুখাপেক্ষী, এখনও স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করিতে শিখেন নাই; মেহেরইবা প্রথমে মাতার নিকট, লাজলজ্জার মাথা খাইয়া, কি প্রকারে আপনার প্রণয়ের কথা বলিবে? দ্বিতীয়তঃ জেলালের অবস্থার কথা কুমারীরও সবিশেষ অবগত, কক্রেমা বিবীও

উভয়ের আন্তরিক প্রণয়ের কথা যে না বুঝিয়াছিলেন, এমন নয়—বলিতে কি, তাঁহারও ইচ্ছা—জেলালকে কন্যাদান করেন, কিন্তু পাত্রের অক্ষমতাই তাহার একমাত্র অন্তরায়। পাঠক বলিতে পারেন যে, তাহা হইলে ফতেমা উভয়ের ঘন ঘন মিলনে বাধা দেন নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, ফতেমা বিবী এ মিলনে কোনরূপ দোষ দেখিতে পান নাই—এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও উভয়ে বাল্যখেলার সাথি। তাহার পর যে, উভয়ে একেবারেই বিবাহ হইতে পারে না, তাহাও তিনি মনে করিতেন না।

যৌবনের প্রারম্ভেই আলাউদ্দীনের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। জগতে বীর আখ্যা ও তৎসঙ্গে ঐশ্বর্য্য লাভ কামনায় সমরক্ষেত্র তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পর, তিনি কায়মনে এই একমাত্র সাধনাতেই রত ছিলেন ও তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন; সুতরাং সংসার ধর্ম্মে তাঁহার বড় আস্থা ছিল না; কিন্তু তিনি একমন হইলেও, রক্তমাংসের শরীরে একভাবে কঠোর সৈনিক-ব্রতের সাধনা আর কতদিন ভাল লাগিবে? বিলাসভোগে সম্ভোগতৃষ্ণার বৃদ্ধি, যে ব্যক্তি এতাবৎকাল যুদ্ধে সংযত থাকিয়া, আহার নিদ্রায় উপেক্ষা করিয়াছেন, এখন ধনদৌলতে ও অপরাপর নানা প্রলোভনে তাঁহারই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহার সুখভোগ কামনা নানাপ্রকারে সমধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কামিনী ও কাঞ্চন—ভোগ বিলাসের প্রধান উপকরণ। একপক্ষে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, অন্যের অভাব এ সময়ে তিনি কি প্রকারে সহ্য করিতে

পারেন ? সেই জন্যই আলা বিবাহের জন্য সুন্দরী পাত্রীর অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে ছাদের উপর মেহেরুল্‌নিশাকে দেখিয়া, তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইলেন, সেই কুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য, বহু-সন্ধানে তাঁহার মাতার সাক্ষাতে এই বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন।

সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে পিতা মাতা মাত্রেই কামনা করিয়া থাকেন। আলাউদ্দীন রাজার ন্যায় সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি-শালী, মেহেরল্‌নিশা তাঁহার গলায় বরমাল্য দিলে, কন্যার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে কোন কষ্ট হইবে না, ভিখারিণী রাজমহিষীর সুখভোগ করিবে, ইহাপেক্ষা মাতার পক্ষে আর অধিক বাঞ্ছনীয় কি হইতেপারে ? তবে, আলাউদ্দীন প্রৌঢ় অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া—প্রায় বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, আর কন্যা সবে কৈশোর অবস্থা পার হইয়া যৌবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে, সেইজন্য যদিও তিনি এ বিবাহের যোগ্যপাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু ধনগরিমায় সে ত্রুটি ধর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হয় না। ফতেমা বিবী এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতেছেন, অথচ এখনও কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। বিষয়ের লোভে বৃদ্ধা একবার মনে মনে সম্মত হইতেছেন, পরক্ষণে আবার স্বর্ণপ্রতিমা মেহেরকে বৃদ্ধের হস্তে সম্প্রদান করিতে, তাঁহার মন সরিতেছে না।

জেলালের সহিত মেহেরল্‌নিশার বিবাহ সম্বন্ধে মাতা বা পুত্রীর —কাহারও অমত হওয়া দূরের কথা, বরং উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা; তবে, জেলালউদ্দীন এখনও উপার্জ্জন করিয়া দিন যাপনে সক্ষম হইতে পারেন নাই—এই এক আপত্তি কারণ; কিন্তু এ ত্রুটির জন্য সে সম্বন্ধ উপেক্ষিত হইবার নহে। অন্যপক্ষে

আলাউদ্দীনের বিষয় বৈভবের পরিচয় শুনিয়া—বৃদ্ধার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, অথচ পাত্রের বয়োধিক্য প্রযুক্ত তিনি সম্মত হইতেও পারিতেছেন না।

পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই যে এক কন্যার পাণিগ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন,এ সংবাদ এতাবৎকাল কেহই জানিতে পারেন নাই। কার্য্য বশতঃ আলাউদ্দীনকে অনেক সময়ে বিদেশে থাকিতে হয়, দেশের লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রায়ই তাঁহার সুযোগ ঘটে না। অন্যপক্ষে, জেলাল বাটীতেই থাকেন, কোন পল্লীতে কে কোথায় বাস করে, কাহার কিরূপ আচার ব্যবহার, কে কিরূপ লোক, কাহার কেমন অবস্থা, সর্ব্বদা যাওয়া আসায় ও সকলের সহিত মেলা মেশা করায়—এ সকল তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন। নদীতটে ফুল তুলিতে যাইয়া, তাঁহার সহিত মেহেরলুন্নিশার প্রথম সাক্ষাতে তিনি কুসুমহার উপহার পাইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে সেই কুমারীর বাটীতেও তাহার গতিবিধি ছিল, যুবক যুবতীতে একত্র বসিয়া কথোপকথনে উভয়েরই অনুরাগের সঞ্চার হয়, কিন্তু মনের বেদনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইত, অভিভাবকের মত না হইলে, মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

জেলাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত মেহেরলুন্নিশার চিত্রখানির যেস্থান আলাউদ্দীন বিকৃত করিয়াছিলেন, অতি যত্নে ও বিশেষ সন্তর্পণে জেলালউদ্দীন সেই স্থানটী পুনরঙ্কণ করিয়াছিলেন। চিত্রখানি যাহাতে নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখায়, তৎপ্রতি যুবকের একান্ত আগ্রহ। সেজন্য পিতৃব্যের নিকট যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইয়াও, অবকাশ সময়ে, চিত্রগৃহে যাইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই চিত্রখানির কাজ

শেষ করিতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। আলেখ্যখানি আপন কক্ষে প্রকাশ্য স্থানে সাজাইয়া রাখিতে জেলালের আন্তরিক আগ্রহ ছিল, কিন্তু পিতৃব্যমুখে তাঁহার আদরের মেহেরকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাত হইয়া. তিনি চিত্রখানি সাজাইয়া রাখিবার মানস ত্যাগ করিয়াছিলেন ও এই বিবাহসম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব সংগ্রহ জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। কথোপ-কথনচ্ছলে একদিনের জন্যও তিনি তাঁহার বা তদীয় পিতৃব্যের পরিচয় মেহের বা তদীয় মাতার নিকট প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার পিতৃব্যই যে তাঁহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন, এসংবাদ তাঁহারাই বা কি প্রকারে জানিতে পারি-বেন? যতদিন না এ সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা হইতেছে, ততদিন জেলালউদ্দীন কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছেন না। ছবি দেখিয়া পিতৃব্য যখন তাঁহার প্রণয়িনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অবশ্য তিনি গুপ্ত প্রণয়ের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন, এইরূপ জেলালের ধারণা। কিন্তু সহসা তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া সর্ব্বাগ্রে চিত্রসংস্করণ কার্য্য সমাধা করিলেন। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, আলাউদ্দীন জেলালকে মেহেরের চিত্র অঙ্কিত করিতে দেখিয়া, একটু সন্দেহ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি উভয়ের প্রণয়ের কথা কিছুই জানিতেন না, পরে জেলালই ক্রোধান্ধ হইয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, মেহের তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রেমপ্রতিদানে প্রতিশ্রুত।

দশম পরিচ্ছেদ।

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পিতৃব্যে ও ভ্রাতুষ্পুত্রে বচসাবশতঃ মনান্তর হয়, তখন দিনমণি অস্তাচলগামী। রবিচ্ছবি পাদপ গুচ্ছের পত্রে পত্রে ও পর্ব্বতমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে খেলা করিতে-ছিল। পশ্চিমাকাশ তপ্ত কাঞ্চনের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত: তরুশাখা ও পর্ব্বতচূড়া সেই আভায় সুরঞ্জিত। ক্রমে ধরাতলের আলোক হ্রাস হইতে লাগিল। মার্ত্তণ্ডদেব দূরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাৎ ভাগে অন্তর্হিত হইলেন। দিবানাথের অদর্শনে প্রকৃতি সুন্দরী তিমির বসন পরিধান করিলেন, আধ আলোক আধ অন্ধকারে ধরণী দেবীর আর এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল—ঠিক যেন অর্দ্ধগুণ্ঠনাবৃতা সুন্দরীর লজ্জারক্তিম বদন। সুনীল নভো-মণ্ডলে একে একে অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র দেখা দিল; কিন্তু সে প্রভায় বসুন্ধরার অন্ধকার বিদূরিত হইল না, অথচ আলোক-আঁধারে চতুর্দ্দিকস্থ পাদপ ও পর্ব্বতশ্রেণীর অদৃষ্ট বিকাশে প্রকৃতির নীরব গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

আলাউদ্দীনের ঘর দ্বার সকল গুলিই নিত্য-নিয়মানুসারে আলোকমালায় সুসজ্জিত হইল। জেলালের চিত্র-শালায়ও বাতি জ্বলিল। যুবক তন্ময়ভাবে চিত্রাঙ্কণে নিযুক্ত, এজন্য ফরাশের যাওয়া আসার দিকে লক্ষ্য করেন নাই।

সময়স্রোত একভাবেই চলে, তাহার বিরাম কোথায়? দেখিতে দেখিতে ঘড়ীতে দশটা বাজিল। জেলাল, আপনার কার্য্যেই সংযত। এদিকে পাচক গৃহে প্রবেশ করিয়া, এক

পার্শ্বে তাঁহার রজনীর ভোজ্য-সামগ্রী রাখিয়া যাইতেছিল, সহসা যুবক তাহাকে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল "কে ও?" জেলালের প্রশ্নে পাচক, সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "হুজুর আমি,—আপনার রাত্রের খাবার রাখিতে আসিয়াছিলাম।"

জেলাল। কেন?

পাচক। আজ্ঞে—মুলুকচাঁদের কথামতে।

জেলাল। মুলুক—ভৃত্য, তাহার কথায় তুমি আমার খাবার এখানে আনিলে কি জন্য?

পাচক। হুজুর! সম্ভবতঃ মুলুকচাঁদের ইহাতে অপরাধ নাই—সে প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছে মাত্র।

জেলাল। তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ! খুড়া মহাশয় আমার খাবার এখানে দিতে বলিয়াছেন? তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

পা। হুজুর, আমাদের কোন অপরাধ নাই; আমি সত্যই কহিতেছি—আমরা প্রভুর আদেশ-পালন করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার ক্রোধ তালপাতার আগুন—এক বার জ্বলিয়া উঠিল—পরক্ষণে কিছুই নাই! এখন হুজুরের উপর একটু রাগিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই একদিন পরে এ রাগের আর কিছুই থাকিবে না। ক্ষণ কাল পূর্ব্বে মুলুকচাঁদ স্বয়ং তাঁহাকে আপনার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর একথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার অপঘাত মৃত্যুর কারণই, তিনি আপনাকে আহার যোগাইয়া হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিতেছেন।

সামান্য ভৃত্যের নিকট পিতৃব্য অবশ্য বিবাদের সকল

কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি আক্রোশ-বশে আমার উদ্দেশ্যে অশেষ-দোষ-পূর্ণ অশ্লীল কটুকাটব্য করিতেছেন! মনে মনে এইরূপ অনেকানেক আন্দোলন পূর্ব্বক, তিনি বড়ই ব্যথাযুক্ত হইলেন, এবং তাঁহার প্রশমিত ক্রোধ-বহ্নি পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল—তিনি দর্প-ভরে বলিলেন ;—"বৃদ্ধের মরণ, সন্নিকট! তদ্দণ্ডে আমি তাহাকে কালের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেই সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যাইত—এরূপ মহাপাতকীর মুখাবলোকনেও, মহাপাপ—পুণ্যাত্মার আত্মাকেও বলবৎ মহাপাতক স্পর্শ করে।"

জেলালের উগ্রভাব-দর্শনে পাচক, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সভয়ে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। প্রভুর সহিত তদীয় ভ্রাতৃ-পুত্রের মনান্তরের কথা, ইতঃপূর্ব্বেই ভৃত্যমহলে ঘোষিত হইয়াছিল, পাচকমুখে জেলালের ভাবভঙ্গিকের কথা শুনিয়া সকলেই স্থির বুঝিল যে, অগ্নি যখন একবার জ্বলিয়াছে—সম্ভবতঃ সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা একটা মহানিষ্টের আশঙ্কা করিতে লাগিল।

মুলুকচাঁদ এখন আর বালক নয়। দ্বাদশ-বর্ষীয় শিশু প্রায় দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনার্য্যের অধীন থাকিয়াও আর্য্যধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগে তাঁহার জ্ঞান-বিকাশ হইয়াছে। প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র জেলাল, তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক হইলেও, উভয়ে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ; কিন্তু মুলুকচাঁদ বিশেষ সাবধান হইয়া, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। তিনি যে মহামন্ত্র হৃদয়ে ধরিয়া এতাবৎকাল আলাউদ্দীনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, সে কথা কথোপকথনে একদিনও জেলালকে ব্যক্ত

করেন নাই; মনের ভাব, মনেই গোপন রাখিতেন। অথচ বাহ্য হাব-ভাবে তিনি তাঁহার সঙ্গে এতই মিশিয়া ছিলেন যে, জেলালের মনের কথা সকলই তাঁহার জ্ঞাত ছিল। মেহের্‌ল্‌-উন্নিসার প্রতি যুবক অত্যন্ত আসক্ত, সময়ে সময়ে তিনি প্রণয়িনীর সহিত দেখা করেন, এ সংবাদও রাজকুমারের অবিদিত ছিল না।

জেলালউদ্দীন মেহের্‌ল্‌-উন্নিসার পাণি গ্রহণ করিবেন, মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃব্য তাঁহার সেই মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই বার্ত্তা জেলালের কর্ণগোচর হওয়াতেই খুড়া ভাইপোর মনান্তর ঘটে। রমণী-ঘটিত ব্যাপার সহজে মিটিবার নয় বুঝিয়াই মুলুক্ তাঁহার মনোরথ পরিপূরণের উপযুক্ত সময় অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধি সহজে সিদ্ধ হইবার নয়—এইজন্য তিনি পিতৃব্য ও ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে মনোযোগী হইয়া চলিতেছিলেন। পিতৃহন্তা আলাউদ্দীন্ খাঁর প্রাণ-বিনাশই মুলুকের মুখ্য উদ্দেশ্য,—তজ্জন্যই তিনি এতাবৎকাল বিজাতীয় অধীনতা-নিগড়ে আবদ্ধ আছেন। বাল্যাবস্থায় মুসলমান কর্ত্তৃক তিনি স্বদেশ হইতে অপহৃত হইয়াছেন, জন্মভূমিতে পুনরায় ফিরিয়া যাইবেন—সে আশা তাঁহার কল্পনাপথে উদয়ও হয় না। তাহার পর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহ মুলুকচাঁদের প্রাণে স্বদেশের কথা জাগ্রত হইয়াছে, কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিতে পারেন—এ সকল সন্ধানও আলার পরিচারকবর্গের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপায়ে সংগৃহীত করিয়াছেন।

এদিকে মেহেরুল্-উন্নিসা ও তদীয় মাতা নানা কারণে সাধের সংসারে দুঃখে কষ্টে দিনপাত করিতেছেন। যে সংসারে গৃহস্বামীর অথবা অভিভাবকের অভাব, তথায় পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের অপ্রতুল না হইলেও অনেক সময়ে পরমুখাপেক্ষি-ভাবে কাটাইতে হয়। কন্যা অপেক্ষা মাতা নৈসর্গিক নিয়মে বয়ঃস্থা। তাহা হইলেও বংশ মর্য্যাদায় পথে ঘাটে বাহির হইতে পারেন না; বহুদিনের প্রাচীন ও প্রবীণ ভৃত্য শেখ উজীর্ মায়া-বশে তাঁহাদিগকে এখনও ত্যাগ করে নাই। গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় সামগ্রীপ্রভৃতি তাবৎ দ্রব্য নিচয় সেই সরবরাহ্ করে।

মোবারক আলির মৃত্যু-কালে মেহেরুল-উন্নিসার বিবাহের উপযুক্ত সময় হয় নাই; কিন্তু মনে মনে তিনি নন্দিনীর উদ্বাহ-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে সে কল্পনা এককালে স্থগিত হইয়াছিল। এক্ষণে পরিণয়ের বয়ঃক্রম অতীত হইতে চলিল, ফতেমা তনয়ার মুখের প্রতি আর চাহিতে পারেন না; কিন্তু, সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও, তিনি মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে নিস্ফল হইতে হইয়াছে। তাহার উপর আবার আলা ও জেলাল উভয়েই কন্যার প্রণয়প্রার্থী হওয়ায়, তাঁহার আরও বিপদ হইয়াছে। একদিকে জেলাল সুচরিত্র ও সৎপাত্র, অপর দিকে অসীম ক্ষমতাশালী ও ধনাঢ্য আলাউদ্দীন—কাহাকে রাখিয়া কাহাকে মনোনীত করেন?

ফতেমা বিবী, এই পাত্রদ্বয়ের একজনকে মনোনীত করিয়া পরম শুভ ও ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। জেলালের সহিত আলাউদ্দীনের যে সম্বন্ধ, এখনও

তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। তবে আলাউদ্দীন্—বিষয়ী লোক; স্বোপার্জ্জনে যথেষ্ট অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে মেহেরল্-উন্নিসার ভরণ পোষণের কোন ক্লেশ হইবে না, কিন্তু বয়োধিক্য প্রযুক্ত তিনি এতদ্ বিবাহে কোন চুক্তি করিতে পারেন নাই।

পক্ষান্তরে—জেলাল্উদ্দীন্ উন্নতি-শীল সহৃদয় যুবক; উপায়ক্ষম না হইলেও যথাসময়ে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দশ টাকা অবশ্যই উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার সহিত নন্দিনী-জননীর দেখা সাক্ষাতে তাঁহার আচার-ব্যবহার উভয় বিষয়েই—উভয়ে বিমুগ্ধা; কিন্তু কন্যার উপস্থিত দৈন্য আশঙ্কায় ও প্রতাপশালী আলাউদ্দীনের ভয়ে ফতেমা বিবী এ বিবাহও কথঞ্চিৎ অপছন্দ করেন।

ফতেমা বিবী স্বয়ং কোন মতামত, স্থিরতর করিতে অশক্ত হইয়াই, একদিন কথোপকথনচ্ছলে কন্যার মনোভাব জানিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেহের! কয়েক দিন হইতে তোমার মনটা যেন কেমন চঞ্চল দেখিতেছি কারণ কি?"

লজ্জাবনতমুখী মেহেরের মুখ হইতে উত্তর হইল;—"মা! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ—মিথ্যা নয়, কিন্তু কেন যে মনটা এমন হইয়াছে, আমি নিজেই তাহা বুঝিতে অক্ষম।"

"এটা তোমার কথার কথা,—তোমার মনের অসুখ, তুমিই ভাল বুঝিবে। আমার বোধ হয়, তুমি মনের কথা খুলিয়া বলিতেছ না। আমি মা—তুমি মেয়ে;—আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতে আছে কি মা? আর, তাহাতে কি তুমি সুখিনী হইবে? আমার মাথা-খাও, কি হইয়াছে—আমায় সকল কথা খুলিয়া বল।"

"মা! সে কথা তোমায় ব্যক্ত করিবার নয়—তাহা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, যখন তোমার মতের সহিত আমার মতামতের মিল হয় না, তখন সে কথা বলিলে—মিথ্যা তোমার প্রাণে কষ্ট দেওয়া হইবে মাত্র। যথার্থই আমি কয়েকদিন হইতে মনের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছি। তোমার সহানুভূতি ভিন্ন কিছুতেই তাহার উপশম হইবার নয়; কিন্তু তুমি মা! আমার প্রতি বিরূপ হইলে, আর আমার আশা-ভরসা কি?"

"মেহের! তুমি কি মনে কর—তোমায় মনঃকষ্ট দিয়া আমার আনন্দ হইবে? তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। তোমার মুখ চাহিয়াই আমি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ। তা না হইলে আমার সংসারে কি প্রয়োজন? সাধ-আহ্লাদ সকলইতো কর্ত্তার সঙ্গে শেষ হইয়াছে। তাই বলি—মা! তোমার কি হইয়াছে আমায় বল, তোমার মলিন মুখ দেখিয়া, আমার বড়ই প্রাণ কেমন করিতেছে।"

"মা! স্নেহ নিম্নগামী। পিতা মাতা—পুত্র কন্যাকে লইয়া সন্তুষ্ট। তুমি আমায় ভালবাস—স্নেহ কর; আমার সুখ-দুঃখের সম অধিকারিণী; কিন্তু মা! আমি রাক্ষসী;—অল্প বয়সেই, পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত। তুমি ছাড়া এ ত্রিজগতে 'আমার' বলিতে আমার আর কে আছে? যখন তুমি আমার ব্যথায় ব্যথিত, আমার প্রাণের জ্বালা তোমায় না জানাইয়া, আর কাহাকে জানাইব? মা! এজগতে স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব—সম্বল। পতির সুখে দুঃখে সতীর অধিকার। যে সংসারে স্ত্রী-পুরুষের মনোমিলন না হয়, সে সংসারে শান্তি কোথায়? তাই বলিতেছি—তুমি যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ, তাহাতে আমার মত নাই। সেই অ-সম্মতি

নিমিত্তই আমার প্রাণ, শান্তি-হারা; দিবা রাত্রি চিত্তে অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। অহঃরহ মনের অসুখে আমার কাল কাটিতেছে। স্বীকার করি—বৃদ্ধের যথেষ্ট ধন আছে; ধনীর পত্নী, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পায় না; কিন্তু, মা! তাঁহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছে। এরূপ দুর্জ্জনের হাতে আমায় সমার্পণ করিয়া—আমার সকল সাধ—সকল আশা ভরসা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিও না?"

কন্যার কথায় বৃদ্ধা উত্তর করিলেন—"মেহের! তুমি অনর্থক ভাবি-বিপদের কল্পনা করিতেছ;—না বুঝিয়া, কি আমি তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ দিতে মনন করিয়াছি? আলাউদ্দীনের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ,—ছেলে বুড়ো সকলেই, তাঁহাকে সম্মান করে। বাপ মা ছেলে মেয়েকে সুখী রাখিতেই ইচ্ছা করেন। তোমার অনিষ্টের কামনা আমি করি না। ঘর-বরের সন্ধানে এতদিন কাটিয়া গেল, মনের মতন সম্বন্ধ কোথাও তো মিলিল না; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, আমি আলা-উদ্দীন খাঁর হস্তে তোমায় সমর্পণ করিবার জন্য একেবারে স্থির সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছি। তবে কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই আমার এক একবার ইচ্ছা হইতেছে।"

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তুমি যাহা ঠিক্‌ করিয়াছ, তাহার অন্যথা হইবে না, এ অবস্থায় আমার মতামতে আর কি প্রয়োজন? তুমি যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই হইবে।"

"না মা! আমি তোমার কষ্টের কামনা করি না। তবে পরিণামে সুখভোগ করিতে পাও, এবং তোমায় সুখিনী দেখিয়া নয়ন

সার্থক করি—এই আমার সাধ! এ সম্বন্ধে তুমি যখন অসম্মত হইতেছ, তখন আমি জোর করিয়া কিছু করিলে, ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। স্থির জানিও,—আমি তোমার অমতে কোন কাজই করিব না। আর এখন তুমি তো আর বালিকা নও, ভাল মন্দ বিচারের শক্তি তোমার হইয়াছে। তুমি যাহাতে মত দিবে, আমি কি তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি?"

বিবাহের কথা লইয়া, মাতা-পুত্রীতে অনেক বাদানুবাদ হইল। অবশেষে বৃদ্ধা কন্যার কথায় এক প্রকার স্বীকৃতা হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আলাউদ্দীন খাঁর এক্ষণে আর বাহ্যিক কোন অসদ্ভাব নাই। উভয়ে পূর্ব্বমত কথাবার্ত্তা চলিতেছে, আহার বিহারে উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া থাকেন, সংসারের সদসৎ নানা বিষয়ে পরামর্শ চলে; কিন্তু আলা জেদী-পুরুষ,—তিনি যখন যাহা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা যতক্ষণ সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। জেলালের সহিত কলহ কালে তিনি মেহেরল্ উন্নিসার পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন, খুড়ো ভাইপোর মনোমালিন্য নিবৃত্তি হইয়াছে,—কিন্তু আলা-উদ্দীন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার লোক নহেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষুণ্ণ-মনা করিয়াছেন, বৃদ্ধাবস্থায় দারপরিগ্রহ অযুক্তিযুক্ত হয়—ইহাও বুঝিয়াছেন,—তথাপি বিবাহ সম্বন্ধে একটা মীমাংসার জন্য তিনি এক দিবস ফতেমা বিবীর সঙ্গে দেখা করিতে

গেলেন ও ফতেমা কর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিতও হইলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পরে, আলাউদ্দীন বলিলেন:—"ইতঃপূর্ব্বে আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি, অচিরেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কামনা করি।" তদুত্তরে ফতেমা বিবী কিঙ্কর শেখ উজীর দ্বারা জানাইলেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার তনয়াটী গ্রহণ করিতেছেন—উহা অপেক্ষা আমার অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে?"

এতদুত্তরে আলাউদ্দীন বলিলেন, "আমি লুব্ধ আশ্বাসে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। কথায় আকাশের চাঁদ ধরা যায়। আমি কাজ চাই, এখন যদি মত স্থির হইয়া থাকে, স্পষ্ট জানিতে পারিলে—আমি সেইরূপ ব্যবস্থা করি।" অন্তরাল হইতে ফতেমা বিবী কিঙ্কর দ্বারা আলাউদ্দীনের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি আলার বাক্য শ্রবণে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—নানা কারণে এ বিবাহ সুসমাহিত হইতে এখনও সম্পূর্ণ মত স্থির হয় নাই। আলাউদ্দীন দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্দণ্ডেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় ফতেমা বিবী নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, আলাউদ্দীনের গলায় বরমাল্য প্রদান করিতে মেহেরল্-উন্নিসা, কোন মতেই স্বীকৃতা নন্। ভবিতব্যতায় যাহা ঘটিবার, তাহাই হইবে। অকারণ তিনি কাহারও মনঃক্ষুণ্ণ করিতে অভিলাষ করেন না, বিশেষতঃ এ বিষয়ে কন্যার অমতে কার্য্য করিলে তাঁহাকে আজীবন কষ্টের ভাগিনী করিতে হইবে, তন্নিমিত্ত বৃদ্ধের সহিত যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তিনি মনে মনে তাহা পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। সহসা আলাউদ্দীন তাঁহাদের নিকেতনে পদার্পণ

করিলেন, সম্ভ্রান্ত পুরুষকে এককালে না বলিয়া বিমুখ করা যুক্তি-যুক্ত নয়—জানিয়াই বিবী কয়েকটী কথার সূচনা করিয়াছিলেন ও কথার কৌশলে আপাততঃ বৃদ্ধের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। এক কথায় আলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধার মনো-বিকারও,—কতকটা ঘুচিয়া গেল।

ইতঃপূর্ব্বে মুলুকচাঁদ ছদ্মবেশে দেখা দিয়া মার ও মেয়ের মনোভাব বুঝিতে আসিয়াছিলেন। আলার সহিত মেহেরল্‌উন্নিসার যাহাতে বিবাহ না হয়, সেই অভিপ্রায়েই যুবক আসিয়াছিলেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন হইল না, সহজেই সে অভিসন্ধি তাঁহার সুসিদ্ধ হইয়া গেল। আলার সঙ্গে জেলালের সম্পর্ক মাতা ও কন্যা উভয়েরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। বৃদ্ধ বিলাস ভোগ বাসনায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে উদ্যত ও একপ্রকার উন্মত্ত, এই বিবাহের কথা লইয়া পিতৃব্যে ও ভ্রাতুষ্পুত্রে কথান্তর হইয়াছিল। একে একে সকল কথাই তাঁহারা শুনিলেন। উগ্রতাও সাধ্যের পরিণাম উভয়েই সম্যক্‌রূপ বুঝিলেন।

প্রেমিক পুরুষ জেলাল্‌ মেহেরল্‌-উন্নিসাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, পরিণয়সূত্রে বদ্ধ না হইলেও, উভয়েই যে উভয়ের অনুরাগী—একের অদর্শনে, অন্যের মনে যথেষ্ট কষ্ট হয়,—ফতেমা বিবী উভয়ের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া একথা সবিশেষ বুঝিয়াছেন, কিন্তু যতক্ষণ চারি হস্ত একত্র সম্মিলিত না হয়—ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। কন্যার সহিত কথোপকথনে তাহার মনোভাব জানিয়াছেন, বৃদ্ধের সহিত বিবাহে একাঙ্গীভূত হইতে মেহেরলউন্নিসার মত নাই,—সেইজন্যই তিনি আলাউদ্দীনের প্রস্তাবে বিশেষ আস্থা দেখাইলেন না।

অপরদিকে মুলুকচাঁদ সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছেন। পিতৃব্যের ও ভ্রাতুষ্পুত্রের চিত্তের অতৃপ্তির যথাসম্ভব উপশম হইলেও, সময়ে যে মহানিষ্ট ঘটিবে, তিনি মনে মনে তাহাও অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। নারী-প্রেম যখন এই মনান্তরের মূল কারণ—তখন এভাব যে সহজে বিদূরীত হইবার নয়, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং জানিয়াছিলেন যে, এই সুযোগেই তাঁহার উদ্দেশ্য সু-সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। এ সময়ে যদি না হয়, পরে আর হইবে না—এ কারণ রাজকুমারের কোনও অংশেই পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। অধিক কি যাহাতে আলাউদ্দীনের সহিত জেলালের চিত্তবিকৃতি অধিকতর সংবর্দ্ধিত হয়, একপ্রকার তদুদ্দেশ্যেই তিনি মেহেরুন্নিশার ভবনে গমন করেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা কহিলে, পরে বিপদের সম্ভাবনা—এই আশঙ্কায় তিনি কোন কথা সুস্পষ্ট বলেন নাই বটে, তথাচ জেলালের ও আলাউদ্দীনের চরিত্র—মাতার ও পুত্রীর জানিতে বাকী রহিল না এবং পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রে যে বিবাদ হইয়াছে—এ সমাচারও তাঁহাদের অবিদিত রহিল না।

আলাউদ্দীন এই বিবাহ সম্বন্ধে যাহা হউক একটা স্থির করিয়া আসিবেন। এই উদ্দেশ্যেই মেহের-জননীর নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফতেমাবিবীর মতামত সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। ইহার কারণ—তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি—ভ্রাতুষ্পুত্র জেলালউদ্দীন—সুন্দর, সচ্চরিত্র যুবাপুরুষ; তাহার উপর, তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ—উভয়ে গোপন প্রণয়-বন্ধনে বদ্ধ, সুতরাং মেহের যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধকে বিবাহ

করিতে সম্মত হইবে—তাহা কখন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; আর ফতেমা বিবী যে একমাত্র নয়নানন্দদায়িনী বয়স্থা কন্যার অমতে, জোর করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন—ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব—তবে আর তাঁহার আশা কোথায়? অনর্থক রাগান্বিত হইয়া জেলালের সহিত বিবাদ করাতেও কোন ফলোদয় হইবে না। অথচ মেহেরকে বিবাহ করিতেই হইবে,—নতুবা জেদ বজায় থাকে না। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় তাঁহার সময় অতীত হয়, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হয় না।

প্রতিজ্ঞা-পূরণে পিতৃব্য কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। আলাউদ্দীন্ মেহেরকে প্রণয়িনী পদে বরণ করিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন;—ধনে মানে সামর্থ্যে সকল বিষয়েই তিনি শ্রেষ্ঠ! এস্থলে প্রেমিক পুরুষ জেলালউদ্দীনকে মেহের-প্রেমে বঞ্চিত হইবারই কথা; কিন্তু যে রমণীর পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রতিদিন চিত্ত-চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া দিবা-নিশি মানসে পূজা করিয়াছেন, যাঁহার অসাক্ষাতেও মানস-চিত্রপটস্থ চিরশান্তিময়ী আদর্শ—দেখিয়া যুবক অন্তরে অতুল শান্তি উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন,—সহসা পিতৃব্যের এবম্ভুত নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি সে যত্নার্জ্জিত আশা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন? যতক্ষণ না তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতেছে—প্রণয়িনীর সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইতেছেন, ততক্ষণ যুবক কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছেন না। সাংসারিক বন্ধনে যে অবলম্বনে তাঁহার দিনপাত হয়, মেহেরকে লাভ করিতে গেলে, তাঁহার সে অবলম্বন চিরদিনের জন্যে ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; কিন্তু বলিলে কি হয়—তাই বলিয়া চিরপোষিত সুখের আশাও একে-

ধারে পরিত্যাগ করা যায় না! খুল্ল-তাত এতাবৎকাল তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, সহসা মেহেরের পরিণয় প্রস্তাবে তাঁহার সে ভাব আর নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, জেলাল্—ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছুই নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছেন না। একমাত্র মেহেরল্নিশার মনোরম প্রেমই তাঁহার এ সম্মুখ বিপদ হইতে উদ্ধারের মূল মন্ত্র। তিনি মনে মনে অবধারিত জানিয়াছেন যে, মেহের কিছুতেই তাঁহার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া অপরের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিবে না। তাঁহার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়—ফতেমা বিবী এ বিবাহে অসম্মতা না হইলেও, পিতৃব্যের অতুল ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণে বিচলিত হইতে পারেন। মাতা কখন দরিদ্রের করে আপন চিত্তপুত্তলীকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। জেলালের একমাত্র সম্বল—যৌবন ও রূপ; পিতৃব্যের সম্বল—সংসারের সার পদার্থ অর্থ ও প্রবল প্রতাপ। জেলালের বড়ই আশঙ্কা—মেহের-জননী কন্যার প্রাণের কথা না বুঝিয়া, হয়তো ধনবান ও প্রতাপ-শালী আলাকেই কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হইবেন। জেলাল মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতেও পারিতেছেন না, অথচ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না; কিন্তু মেহেরল্-নিসার অপূর্ব্ব অপরূপ রূপরাশি তাঁহার চিত্তদর্পণে প্রতিনিয়ত বিভাসিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বলপ্রয়োগে পবিত্র প্রণয় লাভ হয় না। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও আলাউদ্দীন্ পরিণয়-প্রস্তাবে শেষ দিন মেহেরল্-নিসার আলয়ে উপনীত হইলে, তথায় যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, এ বিবাহে তিনি অসুখী হইবেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মেহের বা তাঁহার জননীর এ বিবাহে আন্তরিক মত নাই। বৃদ্ধার মত হইয়াছে—কতক ভয়ে, কতক অর্থ লোভে; কিন্তু বৃদ্ধর উপরও বিশ্বজয়ী মদনরাজার অক্ষুণ্ণ আধিপত্য, অথচ তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না! মনের উদ্বেগে সেই কথা লইয়াই পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতেছেন; কি হইবে না হইবে—কিছু নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। পুত্রের বাঞ্ছিত রমণীতে পিতার লালসা! ধন্য রতিপতি! তোমার প্রতাপে জ্ঞানবান ব্যক্তিও অজ্ঞান ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে! জেলালউদ্দীনের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, তিনি পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া, বধূমাতার চাঁদমুখ অবলোকনে—ইহ-জীবনের সাধ-আহ্লাদ পূরণ করিবেন,—সাধের পারিবারিক জীবনে পুত্রবধূর বদন-দর্শনে তাঁহার ইহ জন্মের—সংসারের সকল সাধপূর্ণ হইবে। এতাবৎকাল ধরিয়া লুণ্ঠনে ও পরপীড়নে তাঁহার জীবন যাপিত হইয়াছে,—একদিনের জন্যও তাঁহাকে শান্তিলাভ করিতে হয় নাই, চিন্তায় ও উদ্বেগেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। জেলালের বিবাহ দিয়া জীবনের শেষ অবস্থায় চিত্ত-শান্তি উপভোগের কথা, কিন্তু মেহেরের অলৌকিক রূপলাবণ্য

তাঁহার সে সুখের পথে ঘোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় তিনি মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। মোবারক-কন্যাকে লইয়া আলা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। তাঁহারই জন্য তিনি ভ্রাতৃপুত্রের মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছেন,—সংসার সমাজ সকল দিক নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—এই বৃদ্ধ বয়সে মেহেরের মোহিনীমূর্ত্তিতে আলাউদ্দীন এতই মোহিত হইয়াছেন যে, কিছুতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না—ঘোর দুশ্চিন্তায় আলাউদ্দীন চিত্তশান্তি হারাইয়াছেন।

এতদিন লুণ্ঠন-লব্ধ রত্নরাজির অধিকাংশ আলাউদ্দীন্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সতর্কতার সহিত তিনি সেইগুলি সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। বহুদিন সহবাসে মুলুকচাঁদের সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কাফের বহুদূর দেশ হইতে আনীত হইয়াছে, ইহজীবনে তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইবার আর সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু, তাহার সংসারে পিতা-মাতা প্রভৃতি—যে সকল আত্মীয় জীবিত ছিলেন, আলা স্বয়ং তাঁহাদের নিধন করিয়া আসিয়াছেন। এতাবৎকাল মুলুকচাঁদ তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোন কারণে তাহার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হইতে পারে না, তিনি প্রাণাধিক জেলালের স্নেহ এক্ষণে এই বিজাতীয় যুবকের প্রতি দেখাইতেছেন. এবং এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস যে, মুলুকচাঁদ হইতে তাঁহার কোন প্রকার অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই! মুলুকচাঁদের প্রতি তাঁহার এতই বিশ্বাস—এতই নির্ভর যে, সেই সমস্ত গুপ্ত রত্নরাজির সন্ধান পর্য্যন্ত মুলুকচাঁদ অবগত; আলা স্নেহবশে সে বৃত্তান্ত রাজ-কুমার সমীপে অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যে দিন পিতৃব্যের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের মনান্তরের সূত্রপাত হয়, সেই দিন হইতেই মুলুকচাঁদ ভীষণ প্রতিশোধের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন। আন্তরিক অনৈক্যতা প্রযুক্ত আলার সহিত জেলালের মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইলেও পূর্ব্ব ভাবের সে আন্তরিক স্নেহের সম্পূর্ণ অভাব দাঁড়াইয়াছে। ক্ষত্রিয়-কুমার মুলুকচাঁদ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাগ্রহে উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিতেছেন। কি ভাবে কোথায় কখন কেমন করিয়া তিনি সযত্ন পোষিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিতে পারিবেন,মনে মনে তাহার সকল অভিসন্ধি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। বিজাতির অন্নে এতাবৎকাল প্রতিপালিত হইয়াছেন—পিতৃ মাতৃহীন হইয়া, যাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে,—অসহায় অবস্থায় যে ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয়দাতা ও অভিভাবক, এবং যিনি শস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন,—সেই প্রতিপালক ও রক্ষাকর্ত্তার সর্ব্বনাশ সাধনে মুলুক কৃতসঙ্কল্প! কিন্তু ইহাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ যুবকের অপরাধ কি? আলাই যুবককে আত্মীয়স্বজন ও সম্পত্তিহীন করিয়াছেন, প্রতিহিংসা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রাজকুমার এই ঈপ্সিত কৃতঘ্ন কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী!

মেহেরল্-নিসার বাটী যাইয়া বিবাহ সম্বন্ধে শেষ কথাবার্ত্তা কহিয়া আলাউদ্দীন্ স্থির বুঝিয়াছেন যে, এ বিবাহ যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্তু তথাপি জেদ্ বজায় রাখিতে সেই কথা লইয়াই তাঁহার দিবানিশি আন্দোলন। স্নেহের পুত্তলী জেলাল তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্দর্শনে তাঁহার মনে কষ্টও হয়—তাহার কারণ পূর্ব্বস্নেহ! খুল্ল-তাতকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে জেলাল

পূর্ব্বে কখন ত্রুটী করেন নাই—এতাবৎকাল ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনকে যথোচিত সম্মান ও মর্য্যাদা দেখাইয়া আসিয়াছেন, কর্ত্তব্য-পালনে কোন অংশে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই, কিন্তু একদিনে, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, মেহেরল্-নিসার পাণি গ্রহণ লইয়া—সেই আবাল্যপোষিত স্নেহের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে! খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রে মনান্তর ঘটিয়াছে। ধন্য রমণী, ধন্য তোমার বিশ্ববিমোহিনী কুহক—যে কুহকে জগৎ সংসার মুগ্ধ—এমন কি যোগীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত যে কুহকজাল এড়াইতে পারেন নাই—কি সাধ্য ক্ষুদ্র মানব তোমার সে বিশ্বজয়ী কুহক হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে? তুমি যখন জননীরূপে স্নেহের ও মমতার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বক্ষরক্তদানে সন্তান প্রতিপালন কর, তখন তুমি দেবী—করুণাময়ী ও বিশ্বজননী ভগবতী মহামায়ার অংশরূপে প্রত্যক্ষীভূতা! ভগ্নী ও কন্যারূপেও স্নেহময়ী মমতাময়ী—ও শান্তিদায়িনী। কিন্তু দেবী, যখন ভুবনমোহিনী রূপের পসরা খুলিয়া মহাজ্ঞানবানকেও জ্ঞানশূন্য করিয়া দাও, মহাপ্রতাপশালী নরপতিকে উন্মত্ত করিয়া শোণিতস্রোতে ধরণী প্লাবিত করিয়া দাও—তখন তুমি বিশ্ববিনাশিনী সংহারকর্ত্তা শঙ্করের শঙ্করী অংশরূপিনী—ও সংহারকারিণী। আবার যখন এই সংসার-ক্ষেত্রে আপন স্বার্থ-সাধনার্থ একজনকে উত্তেজিত করিয়া, অপরের বক্ষে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দাও—যখন আবাল্য একত্র প্রতিপালিত চির স্নেহময় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছেদবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দাও—এমন কি, পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দাও,—যখন বাল্য বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রেমের পরিবর্ত্তে চির শত্রুতার বীজ বপন করিয়া দাও—যখন·

বন্ধুতে বন্ধুতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা পুত্রে তোমার জন্য—তোমার বিশ্ববিমোহিনী-শক্তি বলে উন্মত্ত হইয়া, পরস্পরের শোণিতপানার্থ একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে—তখন তুমি সর্ব্বনাশী—রাক্ষসী—স্নেহমমতাহীনা পাষাণী,—সংসারসুখনাশিনী—পিশাচী। সুন্দরী! তোমায় প্রণাম, কত শত সহস্র যুগ তোমার আরাধনা করিয়া দেবগণ তোমার প্রকৃত মহিমা, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হন না,—ক্ষুদ্র মানবের কি সাধ্য যে তোমার মহিমা বুঝিতে পারিবে? ধন্য রমণী জাতি! চিরস্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রে চির-বিচ্ছেদ হইয়া যে, স্নেহের পরিবর্ত্তে চিরশত্রুতা বীজ রোপিত হইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জেলাল ও মেহের প্রেমিক প্রেমিকা প্রণয়ালাপে যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের সে সাধের মিলনে বাদ সাধিতে এক্ষণে আলাউদ্দীনের এক একবার অনিচ্ছা হইতেছে, কিন্তু মেহেরকে তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না, সেই রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিবার অভিপ্রায়ে তিনি আত্মহারা!

বর ও কন্যাপক্ষীয় বৃত্তান্ত পরস্পর প্রকাশ পাইয়াছে—ইতঃপূর্ব্বে উভয়পক্ষে এ সকল কথা কেহই জানিত না—আলা-উদ্দীন কর্ত্তৃক মেহেরল্-নিসার প্রতিকৃতি খানি বিকৃত করিবার পর হইতে একে একে সকল কথা প্রচার হইয়া পড়িল। আলাউদ্দীন উদ্বাহ-সম্বন্ধে এককালে অনিচ্ছুক হইলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের গোপনে এরূপ প্রেমমিলনের জন্য তাঁহার উপর আলা বড়ই বিরক্ত, তাহাতে আবার উপার্জ্জনের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই, পিতৃব্য তাঁহাকে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবা পিতৃব্যের

বচনে একেবারে আস্থা দেখায় না—এই কারণ পরম্পরায় আলা-উদ্দীনের ক্রোধবহ্নি তাঁহার প্রতি এতই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন প্রকারেই তাহা প্রশমিত হইতেছে না। জেলাল্‌কে তাঁহার মতাবলম্বী করিতে না পারিলে, তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিতে পারিতেছেন না। জেলাল্‌ সামান্য অপরাধে বা অকারণে প্রায়ই তিরস্কৃত হন, ভৎর্সনার প্রত্যুত্তরে দ্বিরুক্তি না করিলেও, তাঁহার পিতৃব্য কর্তৃক জেলালকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হয়।

মেহেরের বাটী হইতে প্রত্যাগত হইয়া অকারণে আলা-উদ্দীন্‌ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবজ্ঞাসূচক ও ঘৃণাব্যঞ্জক যথেষ্ট অপমান করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর—উগ্রতম হইয়া উঠিল। জেলালের স্বভাব চরিত্রের এককালে বৈলক্ষণ্য দর্শন মানসে পিতৃব্য তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র তিরস্কারের উত্তরে কোনও কথাই কহিলেন না; কিন্তু অন্তর্যাতনায় তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। আসব-সেবনে জেলাল্‌ খাঁ অভ্যস্ত ছিলেন। পিতৃব্যের নিকট লাঞ্ছিত হইবার পরেই তাঁহাকে সুরাসুন্দরীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইত। মদিরা সেবনে কিয়ৎক্ষণের জন্য গুরুলোকের গঞ্জনার স্মৃতি তাঁহার অন্তর হইতে দূর হইত। পিতৃব্যের নিকটে শেষবার লাঞ্ছিত হইয়া তিনি মদিরার মাত্রা অধিকতর বাড়াইলেন।

এদিকে আলাউদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বেচ্ছামত তিরস্কার করিয়া স্ব-প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। এতদিন তাঁহাকে নানা উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় সময়াতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ইদানী আমোদ প্রমোদই তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তিনি বাটী ফিরিয়াছিলেন। প্রত্যহ যে সময়ে তিনি বিলাসভোগে নিযুক্ত থাকেন, অদ্যও সেই নির্দ্ধারিত সময়ে সেই পূর্ব্বমত আয়োজন ছিল। পূর্ব্বে আলা-উদ্দীন্ বড়ই সুরাবিদ্বেষ্টা ছিলেন,—মদ্যপায়ীর প্রতি তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানের কিয়ৎ পূর্ব্ব কাল হইতে ভোগলালসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মদিরা পানে বিভোর ও ব্যাসিত হইয়া পড়েন। তিনিই সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা অভিভাবক, সুতরাং তাঁহাকে সদ্যুক্তি-প্রদানের যোগ্য পাত্র আর কেই বা থাকিবে? এই কারণবশতঃ মদ্য পানে তাঁহার অনুরাগ প্রবল হইয়াছে ও দিনে দিনে তাঁহার পানের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে! সমবয়স্ক কয়েক জনের সহিত মিলিত হইয়া, তিনি একত্র পান ভোজনে সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করেন, সঙ্গিগণ সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী—সুতরাং চাটুকার। তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ বৈ অপর উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় তাহাদের নাই। তাই সেই তোষা-মোদকারিরা পদে পদে তাঁহার মন যোগাইয়া চলিত। এরূপ স্থলে তাঁহার অপ্রিয় কোন কথা বলিতে তাহাদের কাহারও প্রবৃত্তি হইত না ও সাহসে কুলাইত না!

আমোদ আহ্লাদের উৎস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ধনশালী বিলাসভোগী আলার পক্ষে সে পথ একান্ত সুপ্রশস্ত। তিনি অল্প দিনের ভিতরেই এক বিখ্যাত সুরাপায়ী ও ঘোরতর বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। স্বার্থপর অনুচরবর্গ যে যাহার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহার সহিত দেখা শোনা করে, আলাউদ্দীন্ অধিক মাত্রায় মদিরা-পান করিলেই তাহাদের আমোদ প্রমোদের

সুবিধা, একারণ যতক্ষণ তিনি স্ব ইচ্ছায় মদ্যপানে বিরত না হই-তেন, ততক্ষণ কেহই তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে ক্ষান্ত করিত না। বিবাহ-বিষয়ক চুক্তি করিতে গিয়া আলাউদ্দীন ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া জেলালকে যথোচিত তিরস্কার পুরস্কার দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চিত্তবৈকল্য উপশমিত হইতেছে না। একারণ অন্যান্য দিনের অপেক্ষা তিনি সুরার মাত্রা বাড়াই-লেন। পান ভোজনের অনুচরগণ ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া আপন আপন বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। মদ্য বিহ্বল আলা-উদ্দীনকে সংজ্ঞাবিহীন অবস্থায় শয্যা গ্রহণে বাধ্য হইতে হইল। পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্র অনতিবিলম্বে চৈতন্য হারাইলেন। ক্ষণকালের জন্য হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায় ও সত্যাসত্য—কোন দিকেই কাহারও লক্ষ্য বা দৃষ্টি থাকিল না। বিস্মৃতির অতল জলে উভয়ে ক্ষণকালের জন্য নিমগ্ন হইলেন।

মদ্য সেবনে এক কক্ষে জেলাল, কক্ষান্তরে আলা—উভয়েই অচৈতন্য। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র সংজ্ঞা-হারা—শয্যাশায়ী, দুই জনেরই শয়নকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত, উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, প্রহরীর অভাব না থাকিলেও, সেই গভীর রজনীতে কেবল-মাত্র প্রজ্বলিত দীপশিখা দুই জনেরই রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত! বেতনভোগী প্রহরিগণ, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তাহারা শরীরধর্ম্ম রক্ষার্থে ভৃত্যের কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ। ঘোর নিশীথে জগৎ নিস্তব্ধ—নীরব—মূর্ত্তি-ধারিণী, লোক-কোলাহল-পূর্ণ আলাউদ্দীনের পুরী জন-শূন্য—অতএব নীরব নিস্তব্ধ। দুঃখের দুঃখী—ব্যথার ব্যথী—রাজকুমার মুলুকচাঁদের চক্ষে নিদ্রা নাই। সেই গভীর রজনীতে

সু-কুমার বিজয়পুর-কুমার নিভৃতে বসিয়া মনে মনে কতই অভিসন্ধি, কত শত জল্পনা কল্পনার চালনা করিতেছেন—তার সীমা নাই! আর ভাবনা চিন্তার অবসরও হয় না। পলে পলে—উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি সমুৎসুক অন্তঃকরণে অপেক্ষা করিতেছেন। স্বহস্তে পিতৃঘাতকের সংহার করিবেন, অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার স্মৃতি-পথে জাগ্রত হইতেছে! পিতার নিধন, মাতার সহমরণ, আত্মীয় স্বজনের জীবন উৎসর্গের কথায় উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী আলোড়িত—প্রতিশোধ-কামনা তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। স্বার্থ-সাধনার্থ তিনি এতই ব্যাকুল যে, যতক্ষণ না তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, বৃথা দণ্ড-পল কাল ক্ষেপণও তাহার পক্ষে যেন যুগ-যুগান্তর অপব্যয় বোধ হইতেছে। লুণ্ঠিত রত্নরাজির সহিত আলাউদ্দীন্ খাঁ বিজয়পুর হইতে এক-খানি সুদৃশ্য শাণিত ছুরিকা আনেন,—তাহার বাঁটটি এক খণ্ড উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হীরক-মণ্ডিত। এই কারণে মহামূল্য প্রস্তর খণ্ড গুলির সঙ্গে তিনি সেই ছুরিকা-খানিও সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

হিন্দু-অহিন্দুর জীবন-বিনাশ করিবে—এই মহোচ্চ আশা বুকে ধরিয়া মুলুকচাঁদ এতাবৎকাল যে দাসত্ব-ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া আসিয়াছেন, সেই ব্রত উদ্যাপনের এই মহা সুযোগ—এ সময়ে মুলুকচাঁদ সহস্র বীরের বল ধারণ করিয়াছেন দেববলে বলীয়ান হইয়াছেন। পূর্ব্বাহ্ণে রাজকুমার সেই অস্ত্রখানি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; উৎকট উৎসাহ-সহকারে সশস্ত্রে রাজকুমার আলাউদ্দীনের কক্ষাভিমুখে দ্রুত-পদবিক্ষেপ করিলেন।

সেই ঘোরা নিস্তব্ধ নিঃস্পন্দ নিশীথে সংগোপনে মুলুকচাঁদ বহুদিনের মনসাধ-সম্পূরণে অগ্রসর!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রজনীর অন্ধকার এখনও বিদূরিত হয় নাই, নীরব ধরিত্রী-দেবীর মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর; ত্রিযামা অবসানের কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই! নিশাচর পশু-পক্ষীগণেরর স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। নিশা অবসানোন্মুখ বুঝিয়া বিহঙ্গবৃন্দের কূজন সময়ে সময়ে নীরব রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। ক্রমে দেবালয়ে মাঙ্গলিক আরত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। প্রাচ্যগগনপ্রাঙ্গণে রবিচ্ছবির বিকাশ না হইলেও, জ্যোতির্ম্ময় মার্ত্তণ্ডদেবের দূরপ্রক্ষিপ্ত রক্তিম আভার বিকাশ পাইতেছে। ফুল্লমুখী মহিমাময়ী প্রকৃতি-দেবীর আদরিণী সঙ্গিনী সুন্দরী ঊষা দেবী আগত প্রায়।

আলাউদ্দীন খাঁর ভবনে নৈশ প্রহরীগণ একে একে, সকলেই সংজ্ঞা লাভ করিতেছে। গৃহস্বামীর শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া কৌতূহল পরবশ হইয়া একজন প্রহরী গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ বিকট চীৎকারে বৃশ্চিক দংষ্ট ব্যক্তির ন্যায় শশব্যস্তে সেইস্থান হইতে সরিয়া গেল। অপরাপর সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে ব্যক্তি সভয়ে অঙ্গুলি সঙ্কেতে প্রভুর গৃহের দিকে দেখাইয়া দিল। সকলে একত্র

হইয়া দ্বারদেশ হইতে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কি দেখিল?—পাঠক বুঝিয়াছেন কি? প্রবল প্রতাপশালী আলা-উদ্দীন আজ আপন প্রহরীবেষ্টিত কক্ষমধ্যে রক্তাক্ত কলেবরে গতপ্রাণ হইয়া পড়িয়া আছেন। কিঁ ভীষণ ব্যাপার! প্রহরিগণ সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! কে এমন কাজ করিল? আমরা প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত—এ দোষ তো আমাদেরই উপর পড়িবে!"

গোলযোগে জেলালের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি সম্মুখে প্রহরীদিগকে দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি?" তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা যেন আরও ভীত হইয়া পড়িল—তাঁহার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। উত্তরের জন্য তাঁহাকে আর অপেক্ষা করিতে হইল না, গা হাত সমস্ত শোণিতসিক্ত অবলোকনে তিনি সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সম্মুখে রক্তমাখা ছুরিকা দর্শনে তাঁহার হৃদয় অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে জেলাল, পিতৃব্যের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; প্রহরিগণ, তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।

গতপ্রাণ পিতৃব্যের রুধিরাক্ত কলেবর দর্শনমাত্রেই জেলাল শোক তাপে একপ্রকার চৈতন্যহারা হইলেন, দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁহার শক্তিতে কুলাইল না, তিনি মৃতদেহের পার্শ্বভাগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হত্যা লইয়া প্রহরিগণের মধ্যে ঘোর তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, কিন্তু উপস্থিত বিপদে গোল করিয়া কোন ফল হইবে না, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া,

একে একে সকলেই নীরব হইল। জেলাল গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে সহর কোটালকে এই শোচনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

কর্ত্তার নিধনে সকলেই ম্রিয়মাণ, কাহারও মুখে অন্ত কথা নাই, সকলেই হা হুতাশ ও আক্ষেপ পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল, এবং কেন এমন হইল? কে এমন করিল?—ইত্যাকার কথা লইয়াই প্রত্যেকে শোকসূচক আন্দোলন করিতে লাগিল। মুলুকচাঁদ, জেলাল ও প্রহরিবৃন্দের সহিত সমভাবেই সহানুভূতি দেখাইতেছেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি যে বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের কাহারও সন্দেহ রহিল না। জেলাল ও অন্যান্য লোকের মত তাঁহারও অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল।

সহরকোটাল অবিলম্বে অনুচরগণ সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করিলেন। প্রমাণ সংগ্রহার্থ উপস্থিত সকলেরই এজেহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন; যে যেরূপ উল্লেখ করিল, তৎসমুদয় তিনি লিখিয়া লইলেন, পরিচারকগণের মুখে কোন কথা ব্যক্ত না হইলেও জেলালউদ্দীনের গৃহ তল্লাসে রক্তাক্ত পরিচ্ছদাদি দৃষ্ট হইল। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিল এবং সকলের কাছে তিনি হত্যাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রে এতাবৎকাল কোন অসদ্ভাব ছিল না। মেঙ্গের ঘটিত ব্যাপার লইয়া যে মনান্তর হইয়াছে, তাহাতে জেলালউদ্দীন এরূপ নৃশংস ব্যাপার করিবেন,— এরূপ কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার গৃহ,

রক্তমাখা ছুরিকা ও বস্ত্রাদি দেখিয়া, সহর কোটালের মনেও বিষম সন্দেহ জন্মিল, তিনিও মনে মনে জেলালকেই হত্যাকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তদ্-বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সংগ্রহে কোন প্রকার ত্রুটি করিলেন না। যতক্ষণ না ফৌজদারি আদালতে বিচার হইতেছে, ততক্ষণ কে সাধু, কে অসাধু কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না।

সহর কোটাল সাধ্যানুরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জেলালউদ্দীনকে লইয়া ফাঁড়িতে চলিয়া গেলেন। তৎসঙ্গে মুলুকচাঁদ ও কয়েকজন কর্ম্মচারীও গেল। জেলালউদ্দীনের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আলাউদ্দীনের মৃত দেহ সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল, কবরস্থ করিবার উপস্থিত কোন ব্যবস্থা হইল না।

হত্যাকাণ্ড হইয়া সহরে মহা সোরগোল উপস্থিত হইল, দলে দলে লোক আসিয়া নানাপ্রকার সন্ধান লইতে লাগিল। আলা জীবিতাবস্থায় বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, অনেককে গৃহ ও আত্মীয় স্বজন হীন করিয়াছেন, এখন তাঁহার মৃত্যুতে তাহারাই আসিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। আলাউদ্দীনের সংসারে জেলাল ভিন্ন অন্য আত্মীয় কেহ না থাকায়, সহরকোটাল তদীয় বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রহরী নিয়োজিত করিয়া দিলেন। কারণ, জেলাল তখন হত্যাকারী বলিয়া ধৃত—বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি এই ভাবেই থাকিবে।

শোক-সংবাদ প্রচারে বিলম্ব হয় না। এই অপ্রীতিকর ঘটনা লোকমুখে স্বল্পক্ষণে সর্ব্বস্থানে ঘোষিত হইয়া পড়িল। আলাউদ্দীনের নিধনের বিবরণ মেহেরলউন্নিশা ও তদীয় জননীরও

"মুলুকচাঁদ" ৮৮ পৃষ্ঠা ।

অবিদিত রহিল না। এরূপ বিপত্তির সংবাদ পাইয়া নন্দিনী ও জননী উভয়েই বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহারা উভয়ে এরূপ উৎসুক হইয়া উঠিলেন যে, পুরাতন ভৃত্য হোসেনকে তত্ত্ব লইবার জন্য আলা-উদ্দীনের গৃহাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে হোসেন সংবাদ পাইল যে, জেলালউদ্দীন পিতৃব্যহত্যাকারী বলিয়া ফৌজদারিতে নীত হইতেছেন, হোসেনের মুখে উক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া মাতা ও পুত্রী উভয়েই সাতিশয় কাতরা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা ও যুবতী উভয়েরই জেলালের স্বভাব চরিত্র সবিশেষ জানা ছিল, তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইল—বিনা অপরাধে যুবক রাজদ্বারে নীত হইতেছেন! অনেক সময়ে তাঁহারা জেলালের নিকট উপকৃত হইয়াছেন, জেলাল তাঁহাদের অভি-ভাবক স্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এরূপ ঘোর বিপত্তিতে তাঁহারা যদি কোন প্রকারে জেলালের সহায়তা করিতে পারেন, এখন তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য—এই চিন্তায় উভয়েই ব্যাকুলিতা হইলেন। কিন্তু একে রমণী, তাহাতে তাঁহাদের সহায় সম্বল কিছু না থাকায় উভয়েই আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। জেলালের উদ্ধার সাধন চিন্তায় উভয়ে বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। জেলালউদ্দীনের বিপদের কথা জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়েই হোসেনালি সমক্ষে উভয়েই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ভৃত্য এরূপ প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত নহে জানিয়া, উভয়কে নীরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু রমণীদ্বয় অনন্যোপায় হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের উদ্দেশে জেলালের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে, জেলালের সাক্ষাৎ

কামনায় ভৃত্যসহ পথিমধ্যে বাহির হইয়াছিলেন। তাহাদের ব্যাকুলতায় ও আকিঞ্চনে উভয়কে লইয়া হোসেন ফাঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

এদিকে ফাঁড়ীতে যথাযোগ্য জামিন দিয়া জেলালউদ্দীন, সহর-কোটালের কঠোর হস্ত হইতে উপস্থিত অব্যাহতি প্রাপ্ত করিলেন। মুলুকচাঁদ ও অন্যান্য অনুচরগণ, যাহারা তাঁহার সমভি-ব্যাহারে ফৌজদারিতে উপস্থিত হইয়াছিল, একে একে সকলেই চলিয়া আসিল।

পথিমধ্যে জেলালের সহিত মেহেরলউন্নিশা এবং ফতেমার সাক্ষাৎ হইল। জেলাল বিপন্ন, এ অবস্থায় তাঁহার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়েই যে মাতা পুত্রী রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন, এ কথা আর বলিয়া জানাইতে হইল না। রমণিযুগলের নয়নাসারে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই জেলালকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাঁহার এ বিপদে অশ্রুবর্ষণ দ্বারা সহানুভূতি দেখান ভিন্ন সে স্ত্রীলোকদ্বয়ের অন্য উপায় আর কি আছে?

জেলাল পিতৃব্যকে বিশেষ স্নেহ ও ভক্তি করিতেন, আলা-উদ্দীনের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি যথাসম্ভব শান্তি উপভোগ করিতে পারেন—এ বিষয়ে ভ্রাতু-ষ্পুত্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সহসা তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃব্যকে কে নিধন করিল, তাহার নিরাকরণ হইতেছে না, পিতৃব্য শোকে তাঁহার প্রাণ বড়ই কাতর! এক দিকে এই বিপদ, অন্য দিকে তাঁহাকে শোকার্ত্ত দেখিয়া কোথায় লোকে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে, সহানুভূতি দেখাইবে, না তাঁহাকেই হত্যাকারী

বলিয়া অবধারিত করিতেছে! সবিশেষ প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে, এ বিপাকে তাঁহার উদ্ধারের উপায় অতি অল্প! কাজি সাহেব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অবশ্য বিচার করিবেন, তিনি সাক্ষ্য গ্রহণে যুক্তিসঙ্গত ভাবে যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই গ্রাহ্য হইবে ও জেলাল যদি অপরাধী সাব্যস্ত হন—তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই "প্রাণদণ্ড" শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

সহানুভূতি প্রকাশ উদ্দেশ্যেই জেলালের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে রমণীযুগল বাটীর বাহির হইয়াছিলেন, পথে কোন কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে না জানিয়াই, তাঁহারা জেলালের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। জেলাল তাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিয়াই জানিতেন। সম্মুখ বিপদে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যুক্তি স্থির করিতে পারিলেও, তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারেন, উৎকণ্ঠাও কতকটা বিদূরিত হয়—তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপে পরামর্শে উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা—এই আশায় জেলাল রমণীদ্বয়কে বাটীতে লইয়া যাইতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। মেহের ও ফতেমা জেলাল উদ্দীনের অনুসরণ করিলেন।

জামিনে খালাস পাইলেও কোটালের হস্ত হইতে জেলাল্ সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইলেন না। থানার লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিতেছিল, যতক্ষণ না এ হাঙ্গামায় তাঁহার অব্যাহতি হয়, ততদিন তিনি কোনমতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না, অধিকন্তু সহর কোটাল নিযুক্ত প্রহরিকুল তাঁহার গতিবিধির উপর সতর্ক লক্ষ্য রাখিতেছে।

শোকভারাক্রান্ত অন্তরে, সহর কোটালের দারুণ লাঞ্ছনায় কাতর চিত্তে জেলালউদ্দীন আবাসে ফিরিয়া আসিলেন;

সমভিব্যাহারী লোকজন, শান্তিরক্ষক নিযুক্ত প্রহরী ও মেহের এবং ফতেমা একে একে সকলেই জেনাল-আবাসে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"সংসারে যেটি যায়, তেমনটি আর হয় না,—তবে মানুষের মন বুঝে না, তাই নষ্টবস্তুর উদ্ধারের চেষ্টা ও গত ব্যক্তির জন্য খেদ করিয়া থাকে—কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? কি ছিলাম, কি হইলাম—এ কথা যখন স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখনই প্রাণ ব্যাকুল হইতে থাকে! ক্ষত্রিয় নৃপতি চৈৎসিংএর বংশধর হইয়া আমি ম্লেচ্ছের অন্নদাস, হিন্দু সন্তান-অহিন্দুর মুখাপেক্ষী। নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন! অর্থ লালসায় এক দিন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, জগতারাধ্য পিতৃমাতৃ ধনে আমায় চিরবঞ্চিত করিয়াছিলে—ধন দৌলত, আমার যাহা কিছু পৈত্রিক ছিল, সকল কাড়িয়া লইয়াছিলে! এখন তোমার সে দিন কোথায়? তোমার সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের পরিণাম কি? এজগতে চিরস্থায়ী কিছুই থাকে না। লোকে কথায় বলে—"পাঁচ দিন চোরের, এক-দিন সাধের" একদিন তোমার প্রতাপে দশদিক কাঁপিত,—দুর্ব্বল ব্যক্তি তোমার ভয়ে সদাই শঙ্কিত হইয়া কালযাপন করিত, এখন নিয়তির শাসনে তুমি চিরনিদ্রাগত—তোমারও দিন ফুরাইয়াছে এবং আমার ও আর সকলের আশকাও দূর হইয়াছে! তুমি বহু সৈন্য লইয়া আমার পৈত্রিক রাজ্য অবরোধ করিতে—অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল আমার পিতৃদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে নিধন করিয়া-

ছিলে, স্বামীর নিধন বার্ত্তা শুনিয়া ধর্ম্মনাশ-আশঙ্কায় সাধ্বী সতী আমার গর্ভধারিণী অপরাপর পুরবাসিনীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া তোমার সম্মুখেই চিতানলে প্রবেশ পূর্ব্বক চির শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। নির্দ্দয়! তোমার ঘোর অত্যাচারে বিজয়পুর শ্রীভ্রষ্ট, আমার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তুমি—ভোগ বিলাসের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলে! সম্মুখ সমরে বৈর নির্য্যাতন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম! জানি আমি—গুপ্ত হত্যায় নরকগামী হইতে হয় এবং আশ্রয়দাতার জীবন সংহার—মহাপাতকের পরিচয়; এ সকল কথা আমার অবিদিত নাই। আর তোমাকে আশ্রয়দাতাই বা বলি কিরূপে? কে আমায় বাল্যকালে নিরাশ্রয় করিয়াছিল? সে তো তুমিই! নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন করিয়া আমার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে! ইহাতে তোমার পৌরুষ কি—তোমার মাহাত্ম্য কোথায়? কেন আশ্রয় দিয়াছিলে?—তাহা তুমিই জান,—বোধ হয়, বালক দেখিয়া তোমার মায়া হইয়া থাকিবে! কিন্তু তুমি আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ—কেবল আমার ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধারণ করিয়াই কি তোমার সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে? না—কখনই না! সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতাও তোমার প্রাপ্য নহে। যে দিন তুমি আমায় বন্দী করিয়া এখানে আনিয়াছিলে, সেই দিন হইতে প্রতিশোধ কামনা আমার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরূক ছিল, সে শুভ কার্য্য সম্পাদনের—সে প্রতিজ্ঞা পূরণের—এতাবৎকাল আমার সুযোগ ঘটে নাই, বহু কষ্টে নানাবিধ উপায়ে তোমায় সন্তুষ্ট করিয়া, তোমার বিশ্বাসভাজন হইয়া—এতদিনের পর আমার সে বাসনা পূরণ হইয়াছে।"

"ক্ষত্রিয়-সন্তান, মরণের বিভীষিকায় ভীত হয় না। প্রতি-ক্ষণেই আমি মরিতে প্রস্তুত, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে—তাহাতেই আমি ধন্য! পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম—কোন দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, আর ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিধন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য না হইলেও, আমি সেই পথই অবলম্বন করিয়াছি! তোমায় বধ করার জন্য আমার পাপ হইবে কেন? আমি পিতৃ মাতৃ ঘাতকের প্রতি প্রতিশোধ লইয়াছি, মহাপাতকের অস্তিত্ব ইহ সংসার হইতে বিলুপ্ত করিয়াছি,—ইহাতেই আমার অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইয়াছে। এখন আমি অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া হত্যাকারীর দণ্ড ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত নহি! তবে দুর্ব্বলের বল—অসহায়ের সহায়—বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা—ভগবান যে আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়াছেন,—তাঁহার অনুকম্পায় যে আমার বহুদিনের রোপিত আশালতা মুকুলিতা হইয়াছে—তাহাতেই আমি কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি! মহাপাতকী আলা আমায় সংসারের সাধে—সকল সুখ ভোগে বাল্যকালেই বঞ্চিত করিয়াছিল, এতদিনে আমি সেই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইলাম! তবে একটা কথা—গুপ্তহত্যা করিয়া আমার ক্ষত্রিয় হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছি! কিন্তু তদ্ভিন্ন আমার অন্য উপায় ছিল না! আলা প্রবল প্রতাপশালী ও বহু সৈন্য বেষ্টিত, আর আমি—একাকী—অসহায়—সুতরাং এরূপ শত্রু নিধন করিতে হইলে, গুপ্তহত্যা ভিন্ন উপায় কি? কার্য্য ঠিকই হইয়াছে—আর ইহাতে আমার কলঙ্কও নাই।"

নিভৃতে আলাউদ্দীনের পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র সমক্ষে দাঁড়াইয়া মুলুকচাঁদ, আপন মনে—এইরূপ কৃতকার্য্যের পর্য্যালোচনা করি-

তেছেন, একবার ক্রোধানলে তাঁহার হৃদয় উদ্দীপ্ত প্রায়, আবার পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে ঘোরতর ভয়ঙ্কর বধ-ব্যাপার লইয়া তিনি একটু পরিতপ্তও হইতেছেন। মনে মনে আদ্যোপান্ত পূর্ব্ব ঘটনাবলীর আন্দোলন করিয়া মুলুকচাঁদ কোন পথ অবলম্বন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। পাপমতি আলাউদ্দীন লোকের স্বার্থনাশ করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, আপনার পদমর্য্যাদার ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারই অত্যাচারে মুলুকচাঁদকে দরিদ্র ও দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে, তথাচ মুলুক আলাউদ্দীনকে নিধন করিয়া কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত! আলার অনুষ্ঠিত নৃশংস কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিয়া প্রবোধিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রভুর নিধনক্ষণ হইতে মুলুকের মনে সম্পূর্ণ শান্তি নাই, কার্য্যটা অন্যায় হইয়াছে বিবেচনায়, তিনি একএকবার মনে মনে অনুতাপ করিতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বেই জেলালের বিচার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। নবাব নিযুক্ত কাজি যথাসাধ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াও জেলালকে ঠিক দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। কর্ম্মচারীগণ প্রভুর বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ভাবে এতাবৎকাল কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপরেও কোন প্রকার সন্দেহ করিতে সক্ষম হন নাই। আলাউদ্দীনের জীবদ্দশায় যখন পরিচারকগণ প্রভুর নিয়মিত আজ্ঞাপালন করিয়া আসিয়াছে,—একদিনের জন্যও তাহারা প্রভুর বিরক্তির কারণ হয় নাই। অধিকন্তু আলা যখন তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন করিয়াছেন, প্রভুপরায়ণ-কর্ম্মচারীগণ তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য যখন সকলেই কাতর

ও শোকাপন্ন; তখন তিনি তাহাদের কাহার প্রতি কেমন করিয়া দোষারোপ করিতে পারেন? তবে, যে কয়েকজন প্রহরী আলাউদ্দীনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের কার্য্যে শৈথিল্য প্রযুক্ত বিচারপতি কর্ত্তৃক তাহারা কথঞ্চিৎ নিগৃহীত হইল; কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রমাণ সংগৃহীত না হওয়ায়, হত্যা জনিত শাস্তি ভোগে তাহারাও অব্যাহতি লাভ করিল।

জেলাল-বিরুদ্ধে কাজি সহরকোটাল সংগৃহীত যে সকল প্রমাণ শ্রবণ করিলেন, সে সকলগুলিই তর্ক বিতর্কে একে একে উপেক্ষিত হইল, কোনটীর প্রতিই তিনি আস্থা প্রদান করিতে পারিলেন না। আলার সহিত জেলালের যে সম্পর্ক, তাহাতে কোনও বিশেষ কারণ ব্যতীত ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক পিতৃব্যের সংহার— একবালে অসম্ভব, সে অসদ্ভাবের তেমন কোন বিশেষ কারণও হয় নাই। অধিকন্তু এতাবৎ কাল আলাউদ্দীন জেলালকে পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রও পিতৃব্যকে গুরুর সম্মান দেখাইয়াছেন। আলাউদ্দীনের আহার বিহারের ও অন্যান্য ব্যবস্থার ভার জেলালের উপর ছিল। পিতৃব্য যতক্ষণ না ভোজন করিতেন, জেলাল অভুক্ত থাকিতেন। আলাউদ্দীনের অভিপ্রায় মত প্রায় সকল কার্য্যই তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার অমতে জেলাল কদাচ কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। চিত্রাঙ্কণে জেলালের চির অনুরাগ বশতঃ পিতৃব্যের নিষেধবাণী সর্ব্বপ্রথম তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পিতৃব্যকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া জেলাল তাঁহার মন্তব্য বুঝাইয়াও দিয়াছিলেন; আলাউদ্দীন

নিষেধ বাণী অমান্য করার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি যদিও প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাচ ভ্রাতৃনন্দনের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় তিনি চিত্রাঙ্কনের জন্য শেষে আর বড় বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। মেহেরের চিত্রখানি নষ্ট করার দিন যদিও সামান্য কারণে আলাউদ্দীন ভ্রাতৃতনয়ের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু জেলালের সেবা শুশ্রূষায় কিছুদিন পরেই তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

ফতেমা ও মেহেরের পরিচয় বিচারপতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলা ও জেলালের সহিত তাঁহাদের যেরূপ আলাপ পরিচয়, সে সমস্তও তিনি শুনিয়াছিলেন। রমণীদ্বয় উভয়েই পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র—দুই জনকেই আদর সম্মান করিতেন। তাঁহাদের সহিত যে ভাবের আলাপ পরিচয়, তাহাতে রমণীদ্বয় হত্যা কাণ্ডে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইতে পারেন না, কাজি সাহেব ইহাও বেশ বুঝিয়াছিলেন।

ফৌজদারী আদালতে বিচারের একপ্রকার চুক্তি হইয়া গেলে, পরিণামে তৎসম্বন্ধে আর আলোচনায় কোন ফল হয় না। ধর্ম্মাসনে সমাসীন হইয়া বিচারপতি চূড়ান্ত বিচারের সিদ্ধান্তই করিয়া থাকেন, তৎসঙ্গে মোকদ্দমারও নিষ্পত্তি হইয়া যায়। তাহার পর আবার সে কথা লইয়া বাদানুবাদ একান্ত নিষ্প্রয়োজন। রাজ-প্রতিনিধি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অমান্য হইবার নহে।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতপক্ষে জেলাল উদ্দীন নির্দ্দোষী, পিতৃব্য হন্তা বলিয়া অভিযুক্ত হইলেও বিচারকের সূক্ষ্ম বিচারে তিনি অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, দেশের গণ্যমান্য লোক অনেকেই জেলালের স্বভাব চরিত্র সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন এবং অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা—তিনি অনর্থক দণ্ড ভোগ না করেন। ভগবান ধার্ম্মিকের সহায়, জেলাল এতাবৎকাল ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্য পালনে কদাচ লঙ্ঘন করেন নাই, বিপদকালেও ধার্ম্মিকের একমাত্র সহায় সেই দয়ানিধান পরমেশ্বরের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—তিনি নির্দ্দোষী, বিনা অপরাধে তাঁহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইলে, বিধির বিধানের অন্যথা হয়, সে ঐশ শক্তির সুবিচার অলঙ্ঘনীয়!

আলাউদ্দীন সঞ্চিত বিষয় সম্পত্তির জেলালই একমাত্র উত্তরাধিকারী, পিতৃব্যের অকাল মৃত্যুতে ভ্রাতৃপুত্র মনঃক্ষুণ্ণ, সংসারের সাধ আহ্লাদে তিনি একান্ত উদাসীন হইলেন, শোকে অধীর হইয়া স্থির করিলেন যে, সংসারধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন; কিন্তু মায়া মোহ বিজড়িত সংসারে সে বিকার কতক্ষণের জন্য? অর্থের মোহিনী শক্তির কাছে শোক তাপ বৈরাগ্য সকলই পরাভব হয়। বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের শোকে অধীর হইয়া স্থির করিল যে, সংসারধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে, কিন্তু পরক্ষণেই দেনাদার দেনা পরিশোধ করিতে আসিলে, সুদের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে ত্রুটি করে না। শোক তাপ স্থায়ী হইলে পৃথিবী অচল হইত।

বহু কষ্টে অর্জ্জিত যথেষ্ট ধন দৌলত খুল্লতাত রাখিয়া গিয়াছেন সেই সমস্ত সম্ভোগ করিতে জেলাল ভিন্ন আর কে আছেন? পৈতৃক কীর্ত্তি বজায় রাখা—বংশধরের অবশ্য কর্ত্তব্য। আলাউদ্দীনের শ্রাদ্ধ শান্তি যথাসময়ে সম্পন্ন হইলে, জেলাল পিতৃব্যের বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণে মনোযোগী হইলেন, পুরাতন পরিচারক, কাহাকেও কর্ম্ম চ্যুত করিলেন না।

একমাত্র মুলুকচাঁদ স্থানান্তরিত, বহু অনুসন্ধানেও জেলাল সেই হিন্দু কর্ম্মচারীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্ধান না পাইয়া, নিশ্চয় অবধারিত হইয়াছিলেন যে, সে যুবক, অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মের জন্য সম্ভবতঃ আত্মঘাতী হইয়া থাকিবে। আর, তাহার সন্ধান হইলেও, যখন সে ব্যক্তি নিজ মুখে আত্ম অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়াছে, আশ্রিত বাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া জেলাল তাহার ঈদৃশ গুরু অপরাধ কদাচ উপেক্ষা করিতে পারেন না, অধিকন্তু কৃত অপরাধ কারণ নিশ্চয়ই মুলুকের প্রাণদণ্ড হইবার কথা। তাহাতে জেলাল ব্যতীত বিচারপতি ও অন্যান্য লোকে মুলুকের আত্মকথা জ্ঞাত হইয়াছেন।

জেলালের আপন কেহ না থাকিলেও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী সকলেই যাহাতে তিনি সংসারী হন, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। সাধের সংসার পাতিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দারপরিগ্রহের প্রয়োজন। জেলালের সংসারে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে কোন আত্মীয় রমণী না থাকায়, অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল, আলাউদ্দীনের জীবদ্দশায় তিনি সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখায়, সে অভাব তাদৃশ লক্ষিত হইত না, তাঁহার অবর্ত্তমানে দিনে দিনে সংসার অন্য মূর্ত্তি ধরিল! এরূপ

অবস্থায় সরঞ্জম সমেত সুবৃহৎ হর্ম্ম্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বেতনভুক্ত কর্ম্মচারীগণের পরিচর্য্যায় উত্তরোত্তর ক্রটি হইতে লাগিল। সংসার ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে, সমাজে মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না; অগত্যা জেলালউদ্দীন বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন, আত্মীয় স্বজনের উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষিত হইল না।

পাণি-গ্রহণ সূত্রে আবদ্ধ না হইলেও, কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মেহের ও জেলালের দেখা সাক্ষাৎ ছিল, উভয়ের কথা বার্ত্তায় মনোনয়নও স্থির হইয়াছিল, এক্ষণে সেই শুভ পরিণয়ের সত্বর ব্যবস্থা হইল। জেলাল উদ্দীন স্বোপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ না করিলেও বর্ত্তমানে সম্বন্ধ সূত্রে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ফতেমাবিবী ভাবি জামাতার পূর্ব্বকালীন অবস্থা জানিয়া কন্যা সম্প্রদানে সম্যক অভিলাষিণী ছিলেন না, কিন্তু সুদীর্ঘ আলাপ পরিচয়ে জেলাল বৃদ্ধার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, মোবারকপত্নী তাঁহার ব্যবহারে সাতিশয় তুষ্টা ছিলেন; তবে জেলালের নিঃস্ব অবস্থার জন্য বৃদ্ধা মনে যেন কথঞ্চিৎ ক্রটি অনুমান করিয়াছিলেন। এক্ষণে জেলালের সে দরিদ্র অপবাদ চিরতরে খণ্ডিত হইয়াছে! যুবকের সরল প্রাণ, পরোপকারী উদারহৃদয় চারুশীলা মেহের মিলনে সোণায় সোহাগা! বর ও কন্যা পক্ষে আর কোন আপত্তি রহিল না। শুভ দিনে শুভক্ষণে মেহেরলন্নিশা জেলাল উদ্দীনের গলায় বরমাল্য পরাইলেন। সে শুভ সম্মিলনে নিরানন্দ পুরী আনন্দে পূর্ণ হইল, আমোদ প্রমোদ ও উৎসবাদির কোন ক্রটি ঘটিল না।

মেহের এক্ষণে জেলালের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন, বাল্য আলাপ প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত! মোবারক-কুমারী দরিদ্র অব-

স্থায় দিন পাত করিয়া সৌভাগ্য ক্রমে সুখের চরম সীমায় আসীনা, গ্রাসাচ্ছাদন জন্য মাতার সহিত তাঁহাকে কত কষ্ট করিতে হইয়াছে, কত দিন অর্দ্ধাশনে তাঁহার দিন কাটিয়াছে, মনোসাধ পূরণে কখন তাঁহার সুযোগ ঘটে নাই, সম্ভাবনাও ছিল না। এক্ষণে ভগবৎকৃপায় সে সকল কথা তাঁহার পক্ষে স্বপ্নস্বরূপ!

জেলালের সংসারে ফতেমা এক্ষণে কর্ত্রী ঠাকুরাণী হইয়াছেন, দাস দাসী তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছে। পুত্রীর সহ মাতা মিলিত হইয়া সংসারের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় জেলালের সংসারে অগৌণে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিল। পিতৃব্যের জীবদ্দশায় জেলাল অকর্ম্মণ্যভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এক্ষণে বিষয় কর্ম্মের সকল ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায়, স্বল্প দিনেই তিনি বিজ্ঞ বহুদর্শী, নিপুণ ও সংযত হইয়া উঠিলেন। সংসার সমাজ ও ধর্ম্ম—সকল দিকেই, তাঁহার গৌরব বাড়িতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মুলুকচাঁদ, আত্মাপরাধ গোপন করিবার লোক নহেন, আলাউদ্দীনের হত্যা কাল হইতে তিনি অস্থিরচিত্তে কাটাইয়াছিলেন। নিরপরাধে জেলাল দণ্ডিত হইলে, মুলুকচাঁদ বিচারকসমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিতে, প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার সে আত্ম প্রকাশের আবশ্যক হয় নাই। বিচারালয়ে সরলভাবে মুক্তকণ্ঠে নিজ দোষ

উল্লেখ করিলে, অনুষ্ঠিত অপরাধ জনিত দণ্ডভোগে অব্যাহতি নাই—ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়সন্তান ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিচক্ষণ কাজির বিচারে নিরপরাধী জেলাল মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বিচারে মুলুক, অন্তরে অন্তরে যারপরনাই সুখী; কিন্তু যতক্ষণ না সত্য ঘটনা, সাধারণে প্রচার হয়, ততক্ষণ তিনি অন্তর্জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধ হইতে-ছিলেন। তাই, মনের উদ্বেগে আলাউদ্দীনের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অকপট চিত্তে উদারপ্রাণে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বগতভাবে সকল কথা মুলুকচাঁদ উল্লেখ করিলেও স্বয়ং কাজি, জেলাল উদ্দীন, মেহেরল্নিশা, ফতেমা বিবী এবং অন্যান্য লোকজন সে আত্মকাহিনী সেই সমাধি সম্বলিত উদ্যানের প্রবেশ দ্বার হইতে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। মুলুকচাঁদকে সমুচিত প্রতিফল প্রদানে তাঁহাদের সঙ্কল্প হইলেও, তাঁহাদিগকে কিন্তু নিরাশ ও নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। যেহেতু মুলুকচাঁদ নিভৃতে বিজন স্থানে আল্লার নামোল্লেখে যে মনের কথা ব্যক্ত করিতেছিলেন, তাহাতে প্রাণের মায়া মমতা না থাকিলেও, জন্মভূমির দর্শন জন্য তাঁহার মন বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিল। হত্যা কাণ্ড সমাধা করিয়াই তিনি নির্ব্বিঘ্নে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু সেটা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহে, নিষ্পাপ জেলাল সর্ব্বপ্রথমেই সহর-কোটাল হস্তে নিগৃহীত, পরে বিচারালয়ে জেলাল নিষ্কৃতি লাভ করিলেও তাঁহাকে খুল্ল-তাত হন্তা বলিয়া লোক পরম্পরায় ঘোষিত হইতে পারে, অকলঙ্ক জেলালকে অনর্থক এরূপ কলঙ্কিত করিতে মুলুক কোনমতে ইচ্ছুক

"মুলুকচাঁদ" ১০২ পৃষ্ঠা।
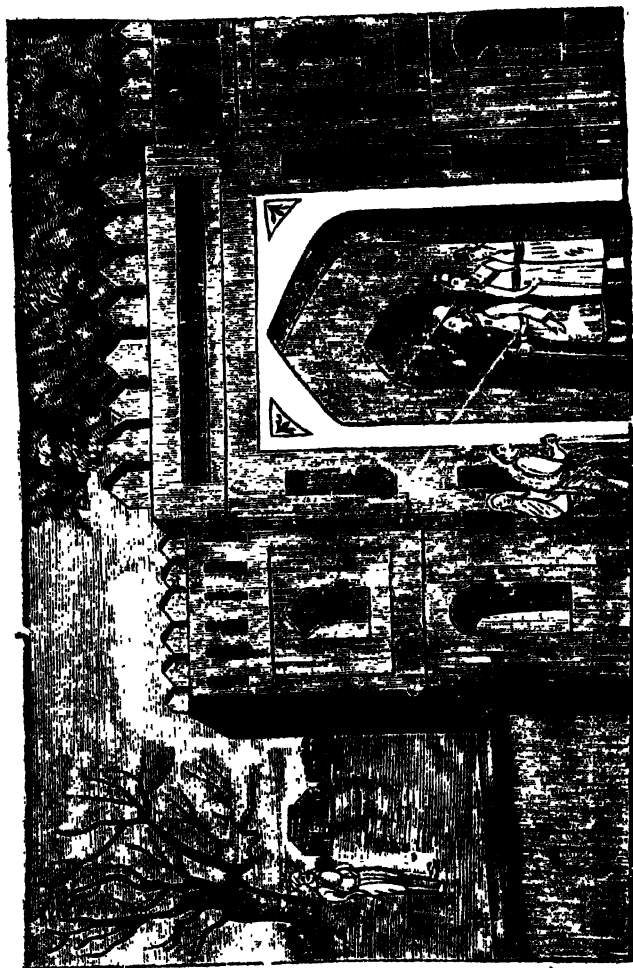
ছিলেন না, এইজন্য আত্মকাহিনী ঘোষণাকালে তিনি দূরস্থিত দর্শকদিগকে দেখিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই; অধিকন্তু তাঁহাদের সম্মুখেই নিজ অপরাধ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র, আর সেখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করেন নাই। অকারণ নিগ্রহ ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, সে স্থান হইতে মুলুক চাঁদ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে শাণিত ছুরিকায় তিনি আলাউদ্দীনের জীবন সংহার করিয়াছিলেন, সেইখানি তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল।

ইতিপূর্ব্বেই মুলুক আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক অপহৃত পৈতৃক রত্নরাজির সন্ধান করিয়াছিলেন, প্রয়োজনমত পাথেয়ও তাঁহার সংগ্রহ হইয়াছিল। দর্শকগণের সমক্ষে মনের কথা সমস্তই বিবৃত হইয়াছে, অবশ্যই তাহারা তাঁহাকে আয়ত্তে পাইয়া অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নিগৃহীত করিবে। অকারণ এ পীড়ন ভোগে মুলুকচাঁদ এক্ষণে আর প্রস্তুত নহেন, স্বদেশপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে, যে কোন উপায়ে হউক জন্মভূমিতে উপস্থিত হইয়া পৈতৃক বাস্তু ভিটা দর্শনে তিনি মনের আনন্দ লাভ করিবেন, আততায়ী লুণ্ঠিত রত্নরাজি—স্বদেশের ধন—স্বদেশে আনিবেন, ইহার অপেক্ষা মুলুকের আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? এ জন্য দর্শকগণ তাহাকে ধরিবার জন্য কয়েকপদ অগ্রসর হইবামাত্র, তিনি উদ্যানের পশ্চাৎ দিক হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে ধাবমান হইয়াও তাঁহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি যে কোন্ দিকে কোন্ পথে কোথায় যাইলেন, জেলাল ও অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক সে সন্ধান হইল না।

ক্ষত্রিয়সন্তান মুলুকচাঁদ নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে বিজাতীয় ভূমি ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বদেশযাত্রা করিলেন।

মুলুকচাঁদ, আলাউদ্দীনের অত্যাচারে পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজন বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বহুকষ্টে আলাউদ্দীন গৃহীত পৈতৃক রত্নরাজি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, জন্মভূমিতে পুনরাগমন করিয়া নিজ পরি-জনবর্গের কাহারও সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা সকলেই বিজাতীয় পীড়নে নিহত; তথাচ মাতৃভূমির মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই! যে বন্ধনে মুলুক এতাবৎকাল আবদ্ধ ছিলেন, শুভগ্রহে সে অবরোধে এক্ষণে তিনি চিরমুক্ত হইয়াছেন। জন্মস্থান দেখিতে তাঁহার একাগ্রতা হইয়াছে, সে সাধ পূরণ করিতে বিলম্ব বশতঃ তাঁহার পলকে প্রলয় বোধ হইতেছে, তিনি চিত্তশান্তি হারাইতেছেন, এই স্বদেশ-যাত্রার উদ্যোগেই তিনি আলার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিকে শত্রুপুরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ, অন্য পক্ষে জন্মভূমি দর্শন লালসা, এই উভয় কামনা মিলিত হইয়া মুলুকচাঁদের দেহে দ্বিগুণ বল ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে।

মুলুকচাঁদ স্বদেশে আসিয়াছেন। সুদীর্ঘকালের অন্তরালে বিজয়-নগরীর পূর্ব্ব-শোভা-সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে। বাল্যাবস্থায় তিনি যাহা দেখিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, এখন তাহার কিছুই নাই বলিলেই হয়: যাহা আছে—তাহাও তাঁহার স্মৃতির অতীত! যৌবনের প্রারম্ভ হইতে রাজকুমার দুঃখে কষ্টে কাটাইয়াছেন, সংসারে সম্যক্ সংশ্লিষ্ট না হইলেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় সকল বুঝিয়াছেন, তিনি দার পরিগ্রহ

করেন নাই, সংসারী হইতে তাঁহার প্রবৃত্তিও ছিল না। এরূপ অবস্থায় জীবনের নির্দ্দিষ্ট দিন পূর্ণ হইলেই, তিনি চরিতার্থ জ্ঞান করেন। ভগ্নোৎসাহে তাঁহার শরীর অবসন্ন, পিতৃহন্তার নিধনে তাঁহার প্রাণে মেঘে বিজলী খেলিয়াছে, কিন্তু সে ভাব কতক্ষণের জন্য? আলাউদ্দীনকে গোপনে হত্যা করিয়া তিনি পরাধীনতা-নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তথাচ গর্হিত কার্য্যের জন্য তিনি সাতিশয় অনুতপ্ত। সাত পাঁচ ভাবিয়া চিন্তিয়া মুলুকচাঁদ আপন মনে গান ধরিলেন ;—

দুনিয়াখানা কি কারখানা, হাসি কান্না যায় না জানা,
সাধে হানা সাধে মানা, দেখে শুনে হই যে অবাক্ !
দু'দিন তরে হেথায় আসা, বুক ভরা তায় কতই আশা,
কল্পনাশা হাতের পাশা, খেলতে বসে দেখায় ফাঁক্।
রাজা প্রজা গরিব ধনী, পথের ধুলা—ফণীর মণি,
ছেলে বুড়া সমান গণি, আচাভুয়ার বোম্বাচাক।
গোলকধাঁধায় মরছি ঘুরে, ঠিক থাকে না নিকট দূরে,
যা'বার পথ তায় না পূরে, ঘটেছে কি বিষম বিপাক !
জন্ম হ'লে আছে মরণ, তার মাঝে এ মায়ার বাধন,
কাজ ক'রে লও পার যেমন, স্মরণ রাখি কুম্ভপাক।
সুখ বা দুঃখ পুণ্য পাপে, ভাল মন্দ কাজের মাপে,
জগৎ চলে ধরম দাপে, নাচৎ বুঝ সরে না বাক্।
ভাবের ঘরে করে চুরি, ভাবের হাটে জারিজুরি,
জোর থাকে কি ভাঙ্গলে ভুরি, যা হ'বার তাই হ'য়ে যাক্।
চল্‌তে জেনে সিধে পথে, কর্ম্মদোষে ধাই বিপথে ;
পুরাতে যে মনোরথে, আছে বিধান ধর্ম্মপাক।

পদে পদে বিধির বিধি, শরণে সে সুখের নিধি ;
কর্‌তে গেলে তার অবিধি, কোথায় কা'র বা থাকে জাঁক ?
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, চিরদিনের নিয়ম যখন,
পাপমতিরে করে নিধন, লাগিয়ে দিছি আচ্ছা তাক্ !
কাজ ক'রেছি মনের মত, উৎযাপিত সাধন ব্রত,
দাসখতে আর নয় তো নত, স্বদেশ বাসে প্রাণ জুড়াক্ !
কেউ কার নয় নশ্বর জীবন, কায়া মায়া কি ছার কাঞ্চন,
শেষের দিনে হবে স্মরণ, আস্‌বে যখন কালের ডাক।

মুলুকচাঁদ স্বদেশে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিয়া কথোপকথনে প্রবাস বাসের জ্বালা যন্ত্রণায় দগ্ধ বিদগ্ধ অন্তঃকরণে তাঁহার শান্তি উপভোগের কথা, কিন্তু ভগবান তাঁহার সে সাধে পূর্ব্বেই বাদ সাধিয়াছেন, এক্ষণে জন্মস্থান দর্শনে সকল অন্তর্জ্বালার শান্তিই তাঁহার মুখ্য কামনা। তিনি পুরীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া এককালে ভগ্নমনোরথ হইলেও সোৎসাহে জন্মস্থানের মাহাত্ম্য জপমালার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"ইয়ং স্বর্ণময়ী লঙ্কা, রোচতে নৈব লক্ষ্মণঃ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥"

সমাপ্ত।